একক ৪ ❑ মহা বিদ্রোহ (১৮৫৭)

গঠন

৪.০ ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পূর্বে ব্রিটিশ শাসনের বি(দ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ
৪.১ সামরিক বিদ্রোহ, উপজাতীয় অভ্যুত্থান এবং কৃষক বিদ্রোহ
৪.২ রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ
৪.৩ কোল বিদ্রোহ
৪.৪ সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫)
৪.৫ ফরাজী এবং ওয়াহাবী আন্দোলন
৪.৬ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ
৪.৭ ১৮৫৭-র বিদ্রোহের উৎপত্তি
৪.৮ মহাবিদ্রোহের ইতিহাস
৪.৯ মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি
৪.১০ বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ
৪.১১ মহাবিদ্রোহের গু(ত্ব
৪.১২ গ্রন্থপঞ্জি
৪.১৩ অনুশীলনী

৪.০ ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পূর্বে ব্রিটিশ শাসনের বি(দ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ—১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্পর্কিত বিতর্ক

ভারতে ব্রিটিশ আত্র(মণ ও আধিপত্য স্থাপনের চরিত্র ছিল পূর্ববর্তী সকল বৈদেশিক চরিত্রের থেকে ভিন্ন। পূর্বে বৈদেশিক অধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে কেবল সর্বোচ্চ স্তরে রাজনৈতিক (মতার পরিবর্তন হয় কিন্তু এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের কোন প্রভাব সাধারণ ভারতীয়ের ওপর পরিল(ত হয়নি। উল্লেখ্য ভারতে ব্রিটিশ আত্র(মণের চরিত্র গুণগতভাবেও ভিন্ন ছিল । এই অত্যুগ্র প্রশাসনের আওতায় ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অর্থনীতি এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয় যার কাঠামো স্থির হয় ব্রিটেনের দ্রুত বিকাশমান, শিল্পায়িত অর্থনীতির সঙ্গে সাজুয্য রেখে। ভারতের বাজারকে উন্মুক্ত(করা হয় ব্রিটেনের প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য এবং ভারত পরিণত হয় ব্রিটেনের কাঁচামাল সরবরাহকারী আনুষঙ্গিকে। বিদেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বিপুল আমদানী ও তার অন্তঃপ্রবাহ ভারতীয় হস্তশিল্পের পরিসরে যেমন দুর্ভাগ্যের সংকেত বয়ে আনে তেমনি কৃষি পরিসরও যারপরনাই (তিগ্রস্ত হয়। ঐতিহ্যিক শিল্পের পতনের ওপর, পশ্চিমী দেশগুলির ন্যায় নতুন শিল্পের প্রতিস্থাপন হয়নি। ফলে শিল্পবিচ্যুত কারিগররা অবধারিত ভাবেই কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে যার দ্বারা জমি এবং কৃষক উভয়েই চাপের সম্মুখীন হয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে ভারতীয়রা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। ব্রিটিশদের বি(দ্ধে ভারতীয়দের প্রাথমিক পর্বের প্রতিরোধগুলিকে আমরা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা—১. অসামরিক বিদ্রোহ, ২. উপজাতীয় উত্থান এবং ৩. কৃষক বিদ্রোহ।

৪.১ সামরিক বিদ্রোহ, উপজাতীয় অভ্যুত্থান এবং কৃষক বিদ্রোহ

ইংরেজ শাসনের বি(দ্ধে জনতার অসন্তোষ প্রাথমিকভাবে অসামরিক বিদ্রোহের রূপ নেয় যা পরিচালিত হয়েছিল ইংরেজ কর্মচারীদের দ্বারা পদচ্যুত ভারতীয় রাজকর্মচারী, জমিদার, কর্মবিচ্যুত মুঘল সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্য জীবিকায় নিযুক্ত(ব্যক্তি(দের দ্বারা। ভারতীয় কৃষক এবং কারিগরদের একটি বিরাট অংশ ইংরেজ শাসন সৃষ্ট অত্যাচারের বি(দ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের কথা বলা যায়, যাকে ইংরেজ শাসনের বি(দ্ধে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ বলা হয়। এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল সন্ন্যাসী ও বাংলার অধিকারচ্যুত জমিদারদের দ্বারা (১৭৬৩—১৮০০) এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে কর্মবিচ্যুত সেনাগন, ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক শ্রেণী, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায় যারা কৃষিকার্য করে জীবিকা নির্বাহ করত। চুয়াড় বিদ্রোহও ছিল একটি অসামরিক অভ্যুত্থান যা বাংলা এবং বিহারের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উত্থিত হয়। (১৭৬৬-১৭৭২)। ইংরেজ শাসনের বি(দ্ধে এইরূপ অভ্যুত্থান সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পলি(ত হয়। এই বিদ্রোহগুলির মুখ্য কারণ ছিল ঐতিহ্যিক অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক কাঠামোর বিচ্যুতি ও অবনমন। ঔপনিবেশিক শাসকের সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের পন্থা ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি আলগা করে দেয়। ফলে ঐতিহ্যিক অর্থনীতিকে পুনর্বহাল করার তাগিদে জমিদার, কৃষক সকলেই প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই প্রতিরোধের ব্যাপকতা ও ধারাবাহিকতা এত তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী ছিল যে, ১৭৫৭ খ্রীঃ ইংরাজ কোম্পানী শাসনের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে ১৮৫৭ খ্রীঃ এর মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত তা বারে বারে দেখা যায়। তবে ১৮৫৭-র পর কৃষক বিদ্রোহের চরিত্রের (ে ত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। কারণ ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর দেশীয় রাজারা হয় পুরোপুরি ধ্বংস হয় নয়ত কোন কোনও (ে ত্রে ব্রিটিশ শাসনের বি(দ্ধে তাদের জয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে পরবর্তী কৃষক বিদ্রোহগুলির প্রধান শক্তি(হিসেবে কৃষকরাই বিদ্রোহ পরিচালনা করে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বি(প্তভাবে ছড়িয়ে থাকা উপজাতিরা ব্রিটিশ শাসনের বি(দ্ধে তীব্র আত্র(মণাত্মক হয়ে উঠেছিল। এই উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায় হলেন ভারতের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ। তারা সাধারণত অরণ্যপার্বত্য অঞ্চলে অর্দ্ধ স্বাধীনভাবে জমি চাষবাস এবং জঙ্গলের কাঠ, ফল-মূল প্রভৃতি ভোগ করতেন। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে কোম্পানী এই সকল অঞ্চলে তাদের পরিকল্পনা মত ভূমি বন্দোবস্ত এবং রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করে। এই কাজে তারা জমিদারদের ব্যবহার করে। কোম্পানীর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, জমিদারী প্রথা ও মিশনারীদের কার্যকলাপ আদিবাসী অঞ্চলে চালু হলে সরল প্রাণ, সাদাসিদা আদিবাসী জনগোষ্ঠী জমিদারদের শোষণ ও মহাজনদের প্রবঞ্চনার শিকার হন। ফলে তাদের (ে াভ বিদ্রোহের পথে পরিচালিত হয়। তাদের অসংখ্য বিদ্রোহের মধ্যে কোল বিদ্রোহ (১৮২০-১৮৩৭) এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার দ্বারা সবচেয়ে বেশী (তিগ্রস্থ হয়েছিল এদেশীয় কৃষক শ্রেণী। ফলে প্রথমদিকের অসামরিক বিদ্রোহগুলির মে(দন্ড ছিলেন এই কৃষক শ্রেণী। তবে বিশেষ সরকারি নথিপত্র না থাকায় সকল কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারিনা। কিছু কিছু কৃষক বিদ্রোহ আবার ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ওয়াহাবী আন্দোলন। ফরাজী আন্দোলন, কুকা আন্দোলন প্রভৃতি।

৪.২ রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩)

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক নিযুক্ত(ইজারাদার দেবী সিংহের নির্মম অত্যাচার ও শোষণের ফলে গোটা রংপুর এবং দিনাজপুর জেলা ছারখার হয়ে যায়। এই অঞ্চলের পুরাতন জমিদাররা দেবী সিংহের বাড়তি রাজস্ব

দিতে না পারায় তাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়। এরপর দেবী সিংহ প্রজাদের যথাসর্বস্ব রাজস্বের জন্য লুঠ করতে থাকেন। এর প্রতিবাদে প্রজারা নু(লউদ্দিন নামে এক ব্যক্তি(কে নবাব ঘোষণা করে সরকারকে খাজনা প্রদান বন্ধ করে। গোটা উত্তর বাংলায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে হেস্টিংসের নির্দেশে সেনা মোগলাহাটের যুদ্ধে ন(লউদ্দিনকে বন্দী করে এবং পাট গ্রামের যুদ্ধে বহু কৃষক বিদ্রোহীদের নিহত করে। দেবী সিংহ বহু রাজস্ব আত্মসাৎ করায় তাকে পদচ্যুত করে অন্য লোককে ইজারাদার নিয়োগ করা হয়। হেস্টিংস তার আশ্রিত দেবী সিংহকে 'রাজা' উপাধি দেন। লুঠ করা অর্থের দ্বারা জমিদারী কিনে দেবী সিংহ নসীপুরের জমিদারীর পত্তন করেন।

রংপুর বিদ্রোহের তাৎপর্য ও গু(ত্ব অবশ্যই অনুধাবন যোগ্য। প্রথমতঃ দেবী সিংহের নির্মম অত্যাচারের বি(দ্ধে বিদ্রোহীরা একটি জোরদার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ এটি ছিল প্রকৃতপ(ে একটি কৃষক বিদ্রোহ। তৃতীয়তঃ, এই বিদ্রোহ ইজারাদারদের কবল থেকে কৃষকদের মুক্তি(দিতে সমর্থ হয়েছিল। ইংরেজ সেনাবাহিনীর দমন সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা তাদের দাবীর প্রতিই অনুগত ছিল। শেষাবধি এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু প্রকৃত অর্থে পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে নিয়েছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার তাদের রাজস্ব নীতির ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং সংশোধনের পদ(ে প গ্রহণ করে। যার প্রকাশ ঘটেছিল ১৭৯৩ খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে।

৪.৩ কোল বিদ্রোহ (১৮৩২)

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বি(ি প্তভাবে ছড়িয়ে থাকা উপজাতিরা ব্রিটিশ শাসনের বি(দ্ধে তীব্রভাবে আত্র(মণাত্মক হয়ে উঠেছিল। এই উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায় হলেন ভারতের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ। ভারতবর্ষে এই আদিবাসী সম্প্রদায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—সাঁওতাল, কোল, ওরাওঁ, মুন্ডা প্রভৃতি। এঁরা সাধারণত অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলে অর্দ্ধ স্বাধীনভাবে জমি চাষআবাদ এবং জঙ্গলের কাঠ, ফলমূল প্রভৃতি ভোগ করতেন। ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে কোম্পানী এই সকল অঞ্চলে তাদের পরিকল্পনামত ভূমি বন্দোবস্ত এবং রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করে। এই কাজে তারা জমিদারদের ব্যবহার করে। কোম্পানীর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, জমিদারী প্রথা চালু হলে সরল প্রাণ, সাদাসিদে আদিবাসী জনগোষ্ঠী জমিদারদের শোষণ এবং মহাজনদের প্রবঞ্চনার শিকার হন। তার উপর ছিল খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ। ফলে আদিবাসীদের ে(াভ প্রকাশ পায় এবং সেই ে(াভ বিদ্রোহের পথে চালিত হয়।

ছোটনাগপুর অঞ্চল ১৮২০ খ্রীঃ এ ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় আসে। ফলে এই অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায় কোলদের ঐতিহ্যিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে। কোম্পানী সরকার রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এই অঞ্চলের জমিগুলি ইজারা দেয়। এই অঞ্চলের ভূস্বামীরা ছিলেন প্রধানত হিন্দু, শিখ অথবা মুসলিম মহাজন। কোল সম্প্রদায় এদের বহিরাগত ডিকু নামে সম্বোধন করতেন। ভূস্বামী এবং ইজারাদাররা কিভাবে সর্বাধিক রাজস্ব আদায় করা যায় কেবলমাত্র সেই বিষয়েই সচেতন ছিলেন। ফলে কোলদের ওপর রাজস্বের চাপ বাড়তে থাকে। সময়ের সাথে সাথে কোলরা তাদের বহু জমি হারায় কেবল রাজস্ব না দিতে পারার পরিণামে। এইরূপ পরিস্থিতিতে ইজারাদাররা নানারকম আইনী বেআইনী উপরিকর আদায় করত কোলদের কাছ থেকে। অন্যথায় জমিদার ও তার প্রতিনিধিদের অত্যাচার ছিল অবধারিত। সরলমতি কোলদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার চালানো হয়। তাদের ঠিকাদার হিসেবে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা হয় কিন্তু তার পরিবর্তে তারা কোন পারিশ্রমিক পেত না। এই উপাজতি সম্প্রদায় ছিলেন মাদকাসক্ত(, যা তারা স্বগৃহে উৎপাদন করতেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার মদের ওপর কর আরোপ করে। কোলদের জমিকে ইংরেজ সরকার আফিমের মত লাভজনক পণ্যশস্য উৎপাদন করতে থাকে, যা চাষ করতে কোলরা প্রত্যাখ্যান

করেছিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় কোলরা অমানুষিক অত্যাচারের বি(দ্ধে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেয়। কোল নেতা বুদ্ধু ভগৎ, জোয়া ভগৎ, ঝিন্দরাই মানাকি এবং সুই মুন্ডা কোলদের সংগঠিত করে। ১৮৩২ খ্রীঃ রাঁচীর মুন্ডা ও ওরাওঁ সম্প্রদায় সর্বপ্রথম বিদ্রোহের আগুন জ্বালায়। ত্র(মেশ সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কোলরা বহিরাগত ডিকুদের ছোটনাগপুর পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয়। J. C. Jha মন্তব্য করেছেন কোল বিদ্রোহ ছিল প্রকৃতির দিক থেকে কৃষক বিদ্রোহ।

এই বিদ্রোহ দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ে সিংভূম, মানভূম হজারিবাগ এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে। যদিও ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে উপজাতিদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিলনা তথাপি এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের (ে ত্রে আঘাত হেনেছিল। কোলরা ভূস্বামী, ইজারাদার, মহাজন, শস্য ব্যবসায়ী এবং ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হয়ে পড়ে। কোলদের শক্ত(হাতে দমন করার জন্য ক্যাপটেন উইলকিনসনের অধীনে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করা হয়। প্রবল বি(দ্ধ প(ে র সঙ্গে কোলরা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধ কৌশল ও আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের কাছে তারা হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। প্রায় দুবছরের প্রচেষ্টায় শাসক শ্রেণী এই অঞ্চলের স্বাভাবিকতাকে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিল। ১৮৩৩ খ্রীঃ ব্রিটিশ শাসকরা বহু কোল প্রাণের বিনিময়ে এই যুদ্ধে জয়লাভ করে।

কোল বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় আদিবাসী শ্রেণীর প্রতি তাদের প্রশাসনিক নীতিকে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করে। ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা উপলব্ধি করেন, সাধারণ আইন উপজাতীয় প্রে(ি তের সঙ্গে সাজুয্য রেখে চলতে পারে না। এই অঞ্চলগুলি ভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা দাবী করে। মহাজন ও ভূস্বামীর হাত থেকে উপজাতিদের র(ার জন্য কিছু নিশ্চিৎ পদ(ে প গৃহীত হয়। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারমূলক চরিত্র কিন্তু কোল বিদ্রোহের পরেও স্বমহিমায় উপস্থিত ছিল।

৪.৪ সাঁওতাল বিদ্রোহ—১৮৫৫

সাঁওতালরা ছিল পরিশ্রমী, সরলমতি, কৃষিজীবী উপজাতি বা আদিবাসী শ্রেণী। এরা ভাগলপুর ও রাজমহলের মধ্যভাগে 'দামিন-ই-কো' নামক অঞ্চলে বাস করত। পরে এরা প্রধানত বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, মানভূম, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। ব্রিটিশ (মতার বিস্তৃতির সাথে সাথে সাঁওতালদের ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়। তারা জমি হারাতে হারাতে ত্র(মেশ পশ্চিমদিকে সরতে থাকে এবং সেখানেই তাদের নতুন বসতি গড়ে তোলে। এই অঞ্চলটিকে তারা 'দামিন-ই-কো' নামে সম্বোধন করত। ১৮৫১ সালে এই 'দামিন-ই-কো' অঞ্চলে প্রায় ১৪৩৭টি সাঁওতাল গ্রাম ছিল এবং প্রায় ৮২,৭১৫ জন সাঁওতাল আদিবাসী এখানে বাস করত।

১৮৫৫ খ্রীঃ সাঁওতালরা ডিকু বা বহিরাগতদের বিতাড়িত করতে দৃঢ় সংকল্প হয় এবং ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হয়। যে কারণগুলি শান্তিপ্রিয় সাঁওতালদের বিদ্রোহী হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল, সেগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন। **প্রথমতঃ,** কঠোর পরিশ্রমী সাঁওতালরা ভূমিউদ্ধার বা সংস্করণের কাজ খুব সাফল্যের সঙ্গে করত। তারা পরিশ্রমের জোরে অনুর্বর জমিকে উর্বর করে তুলেছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের সহযোগী এদেশীয় জমিদাররা বেআইনীভাবে সাঁওতালদের জমি দখল করতে থাকে। কিন্তু এই দরিদ্র উপজাতি সম্প্রদায় কোনত্র(মেই ব্রিটিশ শাসনের বজ্র আঁটুনী থেকে রেহাই পাচ্ছিল না। এমন কি 'দামিন-ই-কো' পরিত্যাগও তাদের মুক্তি(দেয়নি। **দ্বিতীয়তঃ,** ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের ওপর উচ্চ ভূমিকর আরোপ করে যা বহন করা তাদের প(ে দুঃসাধ্য ছিল। এই পরিস্থিতিকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলে ইজারাদার, জমিদার, এবং মহাজনরা, যাদেরকে সাঁওতালরা ডিকু নামে সম্বোধন করত। ব্রিটিশ সরকারকে উচ্চ রাজস্ব প্রদান করতে গিয়ে সাঁওতালদের মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার

করতে হত। একবার এই ধারের কবলে পড়লে তার থেকেমুক্তি(র আর কোন উপায় ছিল না। কারণ সুদের হার ছিল অস্বাভাবিক বেশী, যা সাধারণত ৫০ শতাংশ থেকে ৫০০ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করত। এই ঋণের সুযোগে মহাজনরা তাদের জমিতে সাঁওতালদের বেগার খাটিয়ে নিত। সুতরাং তারা মহাজনের অধীনে দাসে পরিণত হত। এইভাবে সাঁওতালদের অবস্থার অবনতি ঘটতে ঘটতে তারা ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হয়। **তৃতীয়তঃ,** প্রাত্যহিক জীবনেও সাঁওতালরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, যা আগে কখনও তা হয়নি। যেহেতু তারা পরিমাপের নিয়ম নীতি এবং আধুনিক বাজার অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত ছিল না তাই তাদের বিভিন্নভাবে ঠকানো হত। **চতুর্থতঃ,** সাঁওতালরা ডিকুদের বর্বরতার শিকার হয়। প্রায়ই তাদের মারধোর করা হত, অপমানের শিকার হতে হত। নারীদের ওপর মহাজনদের প্রতিনিধি, ইজারাদার, ইওরোপীয় রেলকর্মী ও অন্যান্যরা অত্যাচার চালাত। **পঞ্চমতঃ,** ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে সাঁওতালদের জীবনযাত্রার গুনগত মাপের অবনতি ঘটে। কারণ তারা যে প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় অভ্যস্ত ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে তার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। নতুন আইন আদালত, পুলিশী ব্যবস্থা তাদের কাছে অপরিচিত ছিল। অন্যদিকে নীল চাষের জন্য নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কোন খামতি ছিল না। **ষষ্ঠতঃ,** সাঁওতালদের ধর্মান্তরিত করার জন্য খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপকে সাঁওতালরা প্রশ্রয় দিতে পারেনি। সর্বোপরি সাঁওতালরা ভবিষ্যতে একটি সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিল। ঈ(ের সর্বদা তাদের প(অবলম্বন করবে এই বি(াসই সাঁওতালদের আন্দোলনমুখী হয়ে উঠতে অনুপ্রেরণা যোগায়। 'Calcutta Review' নামে সমসাময়িক একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—"Zamindars, the police, the revenue and court amlas have exercised a combined system of extortions, oppressive exactions, forcible dispossession of property, abuse and personal violence and a variety of petty tyrannies upon the timid and yielding Santhals. Usurious interest on loans of money ranging from 50 to 500 percent; false measures at the haat and the market; wilful and uncharitable trespass by the rich by means of their untethered cattle, tattoos, ponies and even elephants, on the growing cropes of the poorer race; and such like illegalities have been prevalent.

প্রথমে সাঁওতালরা চুক্তি(র জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পন্থাই গ্রহণ করতে চেয়েছিল। তারা আবেদন নিবেদনের মাধ্যমেই তাদের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই নীতি ফলপ্রসু না হওয়ায় সাঁওতালরা বিদ্রোহের পন্থা গ্রহণ করে। ১৮৫০ সালের ৩০ শে জুন ভাগনাডিহির সিধু ও কানুর নেতৃত্বে সাঁওতালরা সংগঠিত হয় এবং ১০,০০০ সাঁওতালকে নিয়ে তারা একটি স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য গড়ে তোলে। তারা বি(াস করত শুভ ও অশুভের যুদ্ধে শুভশক্তি(রই জয় হয়। সিধু, কানু ঘোষণা করেন যে, "ঈ(ের নির্দেশ তারা পেয়েছেন। শক্তি(র বিনাশেব জন্য সাঁওতালদের বিদ্রোহ করা দরকার"। "হুল-হুল" অর্থাৎ বিদ্রোহের ঘোষণা জারি হলে সাঁওতালদের মধ্যে এক অসাধারণ উন্মাদনা ও একতা দেখা দেয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও সাঁওতালদের প্রতি সমর্থন জানায়। দিঘী খানার দারোগা মহেশ দত্ত সিধুকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টায় নিহত হন। এরপর বিদ্রোহী সাঁওতালরা জমিদার মহাজনদের গৃহে ব্যাপক লুঠপাট করেন, সরকারী শাসনকেন্দ্রগুলো ধ্বংস করেন। বহু কুঠী ও নীলের ফ্যাক্টরী ধ্বংস করা হয়। সাঁওতালদের দমনের জন্যে ভাগলপুর থেকে মেজর বারোচাকে পাঠান হলে পীরপাইতির যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন। পাকুড়ের রাজপরিবার সাঁওতাল কৃষকদের শোষণের জন্যে কুখ্যাত ছিল। সাঁওতালরা ১৮৫৫ খ্রীঃ ১২ই জুলাই স্থানীয় কৃষকদের সাহায্যে পাকুড় রাজবাড়ী লুঠ করেন। এরপর মুর্শিদাবাদ, রাজমহল সর্বত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। লর্ড ডালহৌসী সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক আইন জারি করেন। এবং দানাপুর প্রভৃতি সামরিক ঘাঁটি থেকে সৈন্য আনেন। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা পরিচালিত এক বাহিনী সাঁওতাল পরগণার বারহাইতের যুদ্ধে সাঁওতালদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। চাঁদ ও ভৈরব নিহত হন। ইংরাজ সেনাদলের আত্র(মণে বীরভূম থেকে সাঁওতালরা পালাতে বাধ্য হন। সিধু ও কানু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েন। বহু সাঁওতাল বীরের মত সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেন। শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল বিদ্রোহ দমিত হয়। সরকার অধিকাংশ

সাঁওতালদের প্রতি (মা প্রদর্শন করেন। সিধু ও কানু ইংরাজ সেনার গুলিতে নিহত হন। সরকার সাঁওতালদের সুশাসনের জন্য ভাগলপুর ও বীরভূম জেলার কিছু অংশ নিয়ে সাঁওতাল পরগণা নামক অঞ্চল গঠন করেন। সরকারী কর্মচারীদের জনসাধারণের অভাব অভিযোগের প্রতি ল(্য রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। গ্রাম প্রধান বা গাঁও মাঝিকে সম্মান দেওয়া হয়। তবে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল কৃষক বিদ্রোহ। রণজিৎ গুহ তাঁর ''Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India''-তে মন্তব্য করেছেন যে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিরোধ স্বরূপই এই বিদ্রোহ গড়ে উঠেছিল। যদিও এই বিদ্রোহ ছিল এক দুর্বল শ্রেণীর বিদ্রোহ তথাপি অপরাপর শ্রেণীগুলির স্বার্থও এর মাধ্যমে ব্যক্ত(হয়েছিল। রঞ্জিৎ গুহ দেখিয়েছেন যে—একদল ডাকাতদের মাধ্যমে এই বিদ্রোহ অগ্রবর্তী হয়েছিল। ১৮৫৪-র বিরাট সংখ্যক এদেশীয় ডাকাত মহাজনদের বি(দ্ধে এবং সাঁওতালদের প(ে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। যদিও কোন কোন ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে ধর্মীয় চরিত্র দান করতে চেয়েছেন, তথাপি এই বিদ্রোহের মূল চরিত্র ছিল অর্থনৈতিক। যদিও সাঁওতালদের দ্বারা এই বিদ্রোহ বর্ণিত হয়েছে নিষ্পাপী ও পাপীর দ্বন্দ্বরূপে, তথাপি এই বিদ্রোহের মুখ্য কারণ ছিল কৃষি অসন্তোষ। শেষাবধি এই বিদ্রোহকে চরিত্রের দিক থেকে সামন্ততন্ত্র বিরোধী এবং উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনের আখ্যা দেওয়া যায়।

সাঁওতাল বিদোহ ছিল ভারতের কৃষক শ্রেণীর অভ্যুত্থানের এক বর্ণাঢ্য অধ্যায়। এই বিদ্রোহ প্রবল পরাত্র(ান্ত আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ সেনার বি(দ্ধে সামান্য টাঙ্গি ও তীর ধনুকসহ সাঁওতালরা যে লড়াই চালায় তার তুলনা নেই। আত্মসমর্পণ কাকে বলে সাঁওতালরা জানতেন না। সাঁওতাল বিদ্রোহ শুধুমাত্র কৃষক বিদ্রোহ ছিলনা এটি ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ যার মাধ্যমে সাঁওতালরা স্বাধীন, শোষণমুক্ত(, মহাজনী চত্র(ান্ত বিহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ঐতিহাসিক K. K. Dutta মন্তব্য করেছেন—সাঁওতাল বিদ্রোহের মাধ্যমে বাংলা ও বিহার ইতিহাসে একটি নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল। ভারতীয় উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনের (ে ত্রে সাঁওতাল বিদ্রোহ একটি যুগান্তকারী ঘটনা যা ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পথ তৈরী করে দিয়ে যায়।

৪.৫ ফরাজী এবং ওয়াহাবী আন্দোলন

প্রাক্ পরাশী পর্বে মুসলমানরা প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত অন্যদিকে কৃষি ও বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ভার ছিল হিন্দুদের ওপর। যেহেতু রাজনীতি এবং প্রশাসনের গু(দায়িত্ব বহন করত মুসলমানরা, সেহেতু হিন্দুদের হাতে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িক শান্তি কোনভাবেই বিঘ্নিত হয়নি। কিন্তু ১৭৫৭ সালের পর ব্রিটিশদের এদেশে দ্রুত (মতা বিস্তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। কর্ম(ে ত্রে পার্শীর বদলে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার (১৮৩৭ সাল থেকে) ত্র(মশ হিন্দুদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে। কারণ এই সময়—ইংরেজী শি(ার (ে ত্রে হিন্দুদের অগ্রগতি ছিল চোখে পড়ার মত। ১৭৯৩ খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক ধরনের নতুন ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সষ্টি করে যারা ছিল উচ্চবিত্ত হিন্দু যেখানে কৃষকদের একটি বিরাট অংশ ছিল ভগ্নোদ্যম হিন্দু ও মুসলিমরা।

এই পরিপ্রে(িতে ভূস্বামী ও রায়তের দ্বন্দ্ব অতি সহজেই সাম্প্রদায়িক চরিত্র গ্রহণ করে। যদিও কৃষকদের দুর্দশার চরিত্র ছিল মূলত অর্থনৈতিক। মুসলিমরা তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দুর্বলতাকে ধর্মের মাধ্যমে বি(-ষণ করতে তৎপর হয়। অন্যদিকে ইসলামের শুদ্ধিকরণ আন্দোলন ছিল ঊনবিংশ শতকীয় ভারতীয় ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপ(ে এই আন্দোলনগুলি ছিল কৃষক আন্দোলন যাদেরকে ধর্মীয় মহিমা প্রদান করা হয়েছিল। সমসাময়িক ধর্মীয় আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১. বাংলায় ফরাজী আন্দোলন, ২. দিল্লীতে

তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়া, ৩. আরবের ওয়াহাবি আন্দোলন। আরবে ওয়াহাবি আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন আব্দুল ওয়াহাব (১৭০৩—১৭৮৭)। ভারতে অনুরূপ একটি বিদ্রোহ তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়া পরিচালিত হয়েছিল দিল্লীর শাহ, ওয়ালি আল্লাহ-র দ্বারা। তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়ার একজন গু(ত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন সৈয়দ আহমেদ। তার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ও শিখদের বিতাড়িত করে এদেশকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা। জানা যায়. ১৮২০ খ্রীঃ কলকাতায় পরিদর্শনে এসে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। যার ইতিবাচক ফলস্বরূপ ১৮২৭ খ্রীঃ বাংলায় তিতুমিরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করে।

ফরাজী আন্দোলন ঃ ফরাজী আন্দোলন ছিল বাংলায় সংঘটিত প্রথম ইসলাম শুদ্ধিকরণ আন্দোলন। এই আন্দোলনটি বাংলায় প্রবর্তিত হয় ১৮১৮ খ্রীঃ হাজি শারিয়ত আল্লার দ্বারা। ১৭৯৯ খ্রীঃ শারিয়ত মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন এবং সেখানকার ওয়াহাবি আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। গ্রামবাংলায় দরিদ্র কৃষকদের কাছে ফরাজী ভ্রাতৃত্ববোধ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। ফরাজী মতে সকল ফরাজী ছিল সমান। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা অবশ্য এই আন্দোলনে যোগ দেননি। এর মাধ্যমে যে সত্যটি প্রকাশিত হয় তা হল ফরাজী আন্দোলন কিছু অর্থনৈতিক শর্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। ফরাজীরা ব্রিটিশদের দার-উল-হার্ব হিসেবে দেখতেন। সুতরাং প্রথমদিকে এই আন্দোলন একটি রাজনৈতিক রূপরেখাকে অনুধাবন করেছিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন একটি কৃষি চরিত্র ধারণ করে এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় ত্র(মশ বিস্তৃত হতে থাকে। James Wise এবং H. Beveridge শরিয়তকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মানতে অসম্মত হয়েছেন। তারা এটাও মানেন না যে শরিয়তের ফরাজী আন্দোলন ছিল সরকারের বি(দ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ। শরিয়তের পরিচালিত ফরাজী আন্দোলন ছিল একটি সামাজিক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল।

শরিয়ত উল্লাহের পুত্র দাদু মিএ(ার আমলে (১৮১৯-১৮৬২) ফরাজী আন্দোলন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চরিত্র ধারণ করে। পূর্ব বাংলায় দাদু মিএ(ার নেতৃত্বে কৃষকরা জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বি(দ্ধে বিদ্রোহ করে। যখনই মুসলমান কৃষকরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে তখনই জমিদার ও নীলকর সাহেবরা সচেতন হতে শু(করে। ফরাজী কেন্দ্র থেকে লাঠিয়াল বাহিনী আত্মর(ার জন্যে গড়া হয়। দাদু মিএ(া সর্বত্র এই মত প্রচার করেন যে ''জমি আল্লাহের দান। সুতরাং জমিদারদের কর ধার্য করার অধিকার নেই।'' তিনি কৃষকদের অনুপ্রাণিত করেন সরকারের নিয়ন্ত্রিত খাসমহলে বসবাসের জন্য। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপরেখা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দাদু মিএ(া একটি সমান্তরাল সরকার স্থাপন করেন। তার অনুগামীদের সুবিচারের তাগিদে দাদু মিএ(া পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পনর্বহাল করেন। এই থাকবন্দী প্রশাসনিক কাঠামোর প্রধান ছিলেন দাদু মিএ(া।

কানাইপুরের সিকদারদের বি(দ্ধে এবং ফরিদপুরের ঘোষদের বি(দ্ধে দাদু মিএ(ার প্রাথমিক সাফল্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে। অবদমিত কৃষকদের কাছে দাদু মিএ(ার ভাব মূর্তি উজ্জ্বল হতে থাকে। ত্র(মশ ফরিদপুর, পাবনা, বাখরগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে দাদু মিএ(ার জনপ্রিয়তার পারদ চড়তে থাকে। জমিদার ও নীলকর সাহেবরা ফরাজী আন্দোলনের বি(দ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু বিফল হয়। ইওরোপীয় আবাদকারী মি. ডানলপ ছিলেন জমিদারদের বন্ধু এবং দাদু মিএ(ার শত্রু। ১৮৪৬ সালে দাদু মিএ(া মেদিনীপুরে ডানলপের নীলকুঠী আত্র(মণ করলে তাকে এবং তার কয়েকজন অনুচরকে ১৮৪৭ খ্রীঃ গ্রেপ্তার করে আদালত অভিযুক্ত(করে। দাদু মিএ(ার প(থেকে জমিদারদের বি(দ্ধে পাল্টা অভিযোগ করা হয়। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। উচ্চতর আদালতের নির্দেশে দাদুমিএ(া মুক্তি(পান। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় সরকার পুনরায় দাদুমিএ(াকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রমাণের অভাবে মুক্তি(দিতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে

দাদু মিএ(ার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৮৬০ খ্রিঃ এই বিদ্রোহী নায়কের মৃত্যু হলে ফরাজী আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। বিংশ শতকেও এই আন্দোলন বহাল ছিল তবে ধর্মীয় আন্দোলন রূপে। ফরাজী আন্দোলন কৃষক আন্দোলন হলেও সচেতনভাবে তাকে একটি ধর্মীয় মহিমা প্রদান করা হয়েছিল। বিনয় ভূষণ চৌধুরী এই আন্দোলনকে কৃষক আন্দোলন আখ্যা দিতে রাজী নন। তিনি আন্দোলনের অস্পষ্ট চরিত্রের দিকে আলোকপাত করেছেন। যার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না। একটি সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এই আন্দোলনকে সফল হতে দেয়নি।

ওয়াহাবী আন্দোলন ঃ তিতুমীরের বিদ্রোহ ঃ বাংলায় ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন তিতুমীর, যার আসল নাম ছিল মীর নিসার আলি খান। ১৭৭২ খ্রীঃ ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া থানার হায়দারপুর গ্রামে তিতুর জন্ম হয়। ১৮২৩ খ্রীঃ তিনি মক্কায় যান এবং সেখানে সৈয়দ আহমেদের আদর্শে দী(ত হন। এবং বাংলায় ওয়াহাবী আদর্শ প্রচার করেন। ওয়াহাবী আদর্শের মূল কথা ছিল ইসলামের শুদ্ধিকরণ। তিতুমীর বাংলার মুসলমান কৃষক ও কারিগরদের মধ্যে ঐস্লামিক শুদ্ধি আন্দোলনের প্রচার চালান। তিনি ফরাজী আন্দোলনের সমর্থকদের শুত্র(বার ও ঈদে নামাজ পড়ার বিরোধী ছিলেন। তবে ফরাজী আন্দোলনের মতই ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল ধর্মীয় সংস্কার, কৃষি অসন্তোষ ও ব্রিটিশ শাসনকে অবমাননার একটি মিশ্রিত রূপ। তিতুমীর মন্তব্য করেছিলেন ইসলাম হল শান্তির ধর্ম। সুতরাং মুসলিমদের উচিত সেই সকল অমুসলিমদের সাহায্য করা যারা দুর্বল অবদমিত। তিনি ছিলেন সুবক্ত(া এবং তাঁর বক্ত(ব্য অনেক হিন্দুকেও আকর্ষণ করেছিল। তিতুমীর মন্তব্য করেছিলেন—হিন্দু ও মুসলিম, দুই ধর্মেরই কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত অত্যাচারি ভূস্বামী সম্প্রদায় ও আবাদকারীদের বি(দ্ধে। তথাপি তিনি একজন মুসলিম হওয়ায় মুসলিম দমনকারীর সম্মুখে নিরব থেকে ছিলেন। তাঁর আন্দোলনের ধর্মীয় চরিত্রই হিন্দু মুসলিম ঐক্যকরণকে বাধা প্রদান করেছিল। তিতুমীরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার মন্তব্য করেছিলেন যে তিতুমীর প্রথমে তার আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ পথেই পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে জমিদারদের অত্যাচার তার গৃহীত নীতির পরিপন্থী তখনই তিনি শান্তিপূর্ণ পন্থার পরিবর্তন সাধন করলেন। এই আন্দোলন ত্র(মশ হিন্দু জমিদার ও নীল কর সাহেবদের কার্যকলাপ বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়। এবং একধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক চরিত্র ধারণ করে। ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চল যেমন নদীয়া, যশোর, রাজশাহী, ঢাকা, মালদা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রসার লাভ করে।

তারাশুনিয়ার জমিদার রামনারায়ণ, নাগরপুরের গৌর প্রসাদ চৌধুরী, পুরাশের কৃষ(দেব রায় প্রমুখ জমিদাররা নীলকর সাহেবদের সঙ্গে তিতুমীরের বিদ্রোহকে দমন করতে সচেষ্ট হয়। হানাফি মতের অনুরাগী মুসলমানরা তিতুমীরের মতের বিরোধী ছিলেন। কৃষ(দেব রায় তিতুমীরের আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য এই হানাফি মতের অনুরাগীদের সাহায্য নেয়। তিনি এও প্রচার করেন যে তিতুমীরের অনুরাগীদের দাঁড়ির ওপর, মসজিদ নির্মাণের ওপর, এবং বাঙালীদের নাম আরবীতে পরিবর্তনের ওপর কর আরোপ করা হবে। গোহত্যার শাস্তি স্বরূপ দ(ণ হস্ত ছেদনের নির্দেশ দেওয়া হয়। হিন্দু জমিদাররা, হিন্দু রায়তদের স্বপ(আনার প্রচেষ্টা করেন। অতএব সাম্প্রদায়িক চরিত্র এ(ত্রে স্পষ্ট। কৃষ(দেব রায়কে একটি চিঠিতে তিতুমীর লেখেন ঃ ''আমি দীন ইসলাম জারী করিতেছি ইহাতে আপনার অসন্তোষের কি কারণ থাকতে পারে? আপনি ইসলাম ধর্মের আদেশ বিধি নিষেধের ওপর হস্ত(প করিবেন না।'' কিন্তু কৃষ(দেব রায় জমিদার কৃষ(দেব রায় কোনরকম প্রত্যুত্তর প্রদান না করে চিঠি বাহককে বন্দী করেন এবং পরে জেলেই তার মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা তিতুমীর ও তার অনুগামীদের যারপরনাই বিদ্রোহী করে তোলে। আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়। এই আন্দোলন একটি সাম্প্রদায়িক চরিত্র ধারণ করে। কলকাতার জমিদাররা সকলেই কৃষ(দেব রায়ের প(াবলম্বন করে। ডঃ এস. বি. চৌধুরী মন্তব্য করেছেন—যদিও এই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল একটি কৃষক অসন্তোষের মধ্যে দিয়ে তথাপি পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রকটিত হয় ওঠে।

নারকেলবেড়িয়া এবং তার পাশাপাশি গ্রামগুলি তিতুমীরের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। তিতুমীরের

অরাজকতাপূর্ণ কার্যকলাপ। যেমন—হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহে আগুন লাগানো, গোহত্যা প্রভৃতির ভয়ে মানুষ গ্রামছাড়া হয়। লোকজন যোগাড় করে তিতুমীর পুঁড়া গ্রামে কৃষ(দেব রায়ের গৃহ আত্র(মণ করেন। অভিযান চালানোর সময় তিতুমীরের অনুগামীরা হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে ও হিন্দু পুরোহিতদের হত্যা করে। পুঁড়ার দাঙ্গার পর তিতুমীর ঘোষণা করেন যে বাংলায় কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হয়েছে। তিনি একটি সমান্তরাল সরকারের প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন। তিনি নারকেল বেড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা গড়ে তোলেন। যেহেতু নারকেল বেড়িয়ায় বারাসতের প্রশাসনিক বৈধতা প্রতিষ্ঠিত ছিল তাই এই আন্দোলন বারাসাত আন্দোলন নামে পরিচিত ছিল। জমিদার, নীলকর সাহেব ও ইংরেজদের অন্যান্য সহযোগীদের কাছ থেকে পুনঃ পুনঃ সাহায্যের অনুরোধ আসতে থাকায় ইংরেজ সরকার সেনাবাহিনী সহযোগে প্রতিরোধে তৎপর হয়। তিতুমীর ১৮৩১ খ্রীঃ এর ১৯ নভেম্বর গোলার আঘাতে প্রাণ হারান। ইংরেজ কামানের সামনে বাঁশের কেল্লা ভেঙে পড়ে। এভাবে তিতুমীরের ওয়াহাবী বিদ্রোহের অবসান হয়। তবে তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়ার অনুপ্রেরণা তখনও তার মহিমা প্রচার করতে স(ম ছিল।

তারিখ-ই-মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনকে অনেক সময় ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলনের মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু এই দুটি আন্দোলনের মধ্যে কিছু অভিন্নতা থাকলেও এদের যোগসূত্র কোনও ঐতিহাসিক উপাদান দ্বারা সমর্থিত হয় না। ওয়াহাবীরা অতীন্দ্রিয়বাদকে অঐস্মানিক বলে বর্ণনা করেছেন তিতুমীর অতীন্দ্রিয়বাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তিতুমিরের বিদ্রোহের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা চোখে পড়লেও তিতুমীর কোনভাবেই ভারতকে স্বাধীন করার বাসনা পোষণ করেননি। বরং ভারতে মুসলিম শাসন পুনর্বহাল করতে চেয়েছিলেন। R. C. Majumdar মন্তব্য করেছেন—"It was a movement of the Muslim, by the Muslim and for the Muslim." কিন্তু প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হিন্দু জনসাধারণ কিন্তু বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তথাপি এর সাম্প্রদায়িক চরিত্রটিকে অস্বীকার করা যায় না, যার প্রভাব দেখা গিয়েছিল পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলিম বিভাজনের মধ্যে।

৪.৬ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ

লর্ড ক্যানিং-এর রাজত্বকালে উত্তর ও মধ্যভারতে ১৮৫৭ খ্রীঃ-এ যে বিদ্রোহ ইংরেজ কোম্পানী শাসনের ভিতকে নাড়িয়ে দেয় তাই ভারতীয় ইতিহাসে মহাবিদ্রোহ নামে অভিহিত। এই অভ্যুত্থান ছিল চরিত্রের দিক থেকে বৃহদায়তন। এই বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী বা সিপাহীদের বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে। যারা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বিদ্রোহ একটি জনপ্রিয় চরিত্র ধারণ করে। যদিও প্রথম দিকে কয়েকজন ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দিয়েছেন, তথাপি বলা যায়, পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ব্রিটিশ শাসনের বি(দ্ধে মানুষের মনে যে পুঞ্জীভূত (োভ দানা বেঁধেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ছিল এই বিদ্রোহ। ভারতীয়রা কখনওই ইংরেজ শাসনকে অভিবাদন জানাতে পারেনি। আর অর্থনৈতিক অসন্তোষ এই পরিস্থিতির আরও অবনত ঘটিয়েছিল। ব্রিটিশ (মতা এদেশের বিস্তৃত (ে ত্রে যতই বদ্ধমূল হতে থাকে, এদেশীয় মানুষের অসন্তোষ ততই প্রকট হতে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে এই অসন্তোষ মানুষকে বিদ্রোহী করে তোলে। এইরকমই একটি জনপ্রিয় বিদ্রোহ, হল ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ, যা ব্রিটিশ শাসনের ভিত আলগা করে দেয়।

৪.৭ ১৮৫৭-র বিদ্রোহের উৎপত্তি

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পশ্চাতে অনেক কারণ দায়ী ছিল, যারা একত্রিত হয়ে এই বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পায়। এই বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশদের অত্যাচারের বি(দ্ধে ভারতীয়দের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের কারণগুলিকে আমরা বিভিন্ন

দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি, যেমন— অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামরিক,— যে কারণটিকে আমরা সাধারণত মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রধান কারণ রূপে অভিহিত করে থাকি।

এদেশের অর্থনীতির ওপর ব্রিটিশদের অত্যাচার এবং এদেশের ঐতিহ্যিক অর্থনীতির ভাঙন ছিল মহাবিদ্রোহের অন্যতম কারণ। নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ভারতীয় পুরাতন জমিদারদের জমি থেকে বিচ্যুত করে। নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে সর্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা যায়। এই নীতি প্রাক্ ব্রিটিশ কৃষি অর্থনীতিতে আঘাত হানে। কৃষকরা সর্বাধিক (তিগ্রস্ত হয়। নতুন ভূমি বন্দোবস্তের ফলে মহাজনদের গু(ত্ব বৃদ্ধি পায়। এর ফলস্বরূপ গ্রামীণ মানুষরা, যাদের মধ্যে কারিগর ও হস্তশিল্পীরাও অন্তর্ভুক্ত(ছিল, তাদের জীবনযাত্রার অবনমনের সম্মুখীন হয়। অবস্থার অবনতি তাদের জীবনে অনাহারকে ডেকে আনে।

নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ভারতীয় কর্মচারীদের বিভিন্ন পদ থেকে বিচ্যুতির ফলে বেকারত্বকে যে প্রশাসনিক পরিকাঠামো প্রশ্রয় দিয়েছিল তার দ্বারা জনসাধারণের অবস্থার আরও অবনতি হয়। জনসাধারণ ব্রিটিশ এজেন্সিগুলি যেমন—পুলিশী ব্যবস্থা, আইন আদালত, বিভিন্ন সরকারী বিভাগের দ্বারা অবদমিত হতে থাকে। ভারতীয় জনসাধারণের, দুঃখ দুর্দশার সুবিচারের আশায় আদালতে প্রবেশের কোন অধিকারই ছিল না। আইনের শাসনব্যবস্থা আইনের দরবারে সকলের সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। অন্যদিকে দরিদ্রদের দমন করার কাজে এই আইন ধনীদের সাহায্য করেছিল। এইভাবে ত্র(মবর্ধমান দারিদ্র ও নিঃসহায়তা জনসাধারণকে ব্রিটিশ শাসনের বি(দ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে। অন্যদিকে ভারতের কিছু র(ণশীল ব্যক্তি(, যারা পশ্চিমী উদারনীতির ফলে আনিত পরিবর্তনগুলির প্রতি সদয় ছিলেন না তারাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

এছাড়া খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচার ভারতীয় জনসাধারণের মতো (ে াভ ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ভারতের গ্রামে, গঞ্জে, শহরে সর্বত্র মিশনারীরা প্রচার চালাত। বিদ্যালয়, হাসপাতাল এমনকি জেলখানাতেও মিশনারীরা প্রচার চালাত। সাধারণ লোককে খ্রীষ্টধর্মে দী(ত করা ছিল তাদের প্রধান ল(্য। লোকে মনে করত যে, সরকার এই সকল মিশনারীদের দ্বারা খ্রীষ্টধর্মে জনসাধারণকে দী(ত করাকে সমর্থন করেন। কারণ শাসকশ্রেণীর ধর্ম ও খ্রীষ্টীয় প্রচারকদের ধর্ম ছিল এক। মিশনারীদের পুলিশী নিরাপত্তা দেওয়া হত। সরকারী কর্মচারীরা মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে সহায়তা করত। বিদ্যালয়ে ধর্মশি(ার মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে সহায়তা করা হত। মিশনারীরা দরিদ্র লোকের দূরবস্থার সুযোগ দিয়ে খ্রীষ্টধর্মে বহু লোককে ধর্মান্তরিত করায় জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। ১৮৩৭ খ্রীঃ দুর্ভি(ে র সুযোগে উত্তর পশ্চিম ভারতে বহু শিশুকে খ্রীষ্টধর্মে দী(ত করা হয়। ১৮৫০ খ্রীঃ সরকার এক আইন দ্বারা নিয়ম করেন যে, কোন ব্যক্তি(ধর্মান্তর গ্রহণ করলেও পিতার সম্পত্তিতে সেই ব্যক্তি(বঞ্চিত হবে না। এই আইনকে সাধারণ লোকে তাদের ধর্ম বি(্বাসের ওপর আঘাত বলে মনে করে।

কোম্পানী নির্বিচারে দেশীয় রাজ্যগুলিকে অধিগ্রহণ, ইংরেজ সরকারের আগ্রাসী মনোভাব জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিত্রি(য়ার সৃষ্টি করে। দেশীয় রাজ্যগুলি অধিগ্রহণ করায় দেশীয় রাজা এবং তাদের পরিবারবর্গ ও আশ্রিত সামন্তশ্রেণীর ঘৃণা ও বিদ্বেষ দেখা দেয়। সাধারণ প্রজাদের মনেও অনুরূপভাবে ইংরেজ শাসনের প্রতি ঘৃণা দেখা যায়। লর্ড ওয়েলেসলি তাঁর বশ্যতামূলক মিত্রতা নীতির প্রয়োগ দ্বারা অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যকে ইংরেজের প্রত্য(বা পরো(অধীনতার জালে আবদ্ধ করেন। লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ব বিলোপ নীতি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন আত্মপ্রকাশ। এই নীতির প্রয়োগ দ্বারা ডালহৌসী কোম্পানী আশ্রিত দেশীয় রাজাদের পুত্রসন্তান না থাকলে দত্তক গ্রহণ দ্বারা উত্তরাধিকারীর ব্যবস্থা করার চিরাচরিত অধিকার নাকচ করেন। দত্তক গ্রহণ ছিল হিন্দু সমাজের প্রাচীন প্রথা। এই অধিকার লোপ করায় সকল শ্রেণীর হিন্দুর মনে তীব্র বিদ্বেষ দেখা দেয়। বহু সংখ্যক দেশীয় রাজ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে কোম্পানীর দ্বারা

বাজেয়াপ্ত হয়। সাতারা, জৈৎপুর, সম্বলপুর, ঝাঁসী, নাগপুর প্রভৃতি রাজ্য অধিগ্রহণ করা হয়। এমনকি পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানাসাহেবের প্রাপ্য ভাতা লোপ করা হয়। নাগপুরের বিখ্যাত মারাঠা অধিপতি ভোঁসলের উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁর রাজ্য ও রাজপরিবারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ইংরেজের এই অত্যাচার ও নিপীড়নমূলক আচরণ দেশীয় রাজা এবং সামন্তদের মনে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

এভাবে যখন ভারতীয় জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বি(োভের বা(দ জমা হচ্ছিল তখন অকস্মাৎ সিপাহীদের বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে আগুন জ্বলে ওঠে। কোম্পানীর অধীনে ব্রিটিশ সৈন্যরা সামরিক বিভাগের সকল উচ্চপদগুলি দখল করে রেখেছিল। ভারতীয় সিপাহীদের সেই পদ লাভের কোন সুযোগ ছিল না। ফলে উচ্চপদস্থ অফিসারদের সাথে ভারতীয়দের দূরত্ব এবং পার্থক্য ত্র(মশ বাড়তে থাকে। গুজব ছড়াতে থাকে যে হিন্দু, শিখ এবং মুসলিম সিপাহীদের ধর্মান্তরিত করা হবে। ইতিপূর্বে কিছু ভারতীয় সিপাহীকে আফগানিস্থানে পাঠানো হয় তাদের ইচ্ছের বি(দ্ধেই। এবার ঘোষণা করা হয় হিন্দু সিপাহীদের কালাপানি পার হতে বাধ্য করা হবে, যা হিন্দু ধর্মে নিষিদ্ধ। ১৮৫৬ খ্রীঃ জেনারেল সার্ভিস এনলিস্টমেন্ট (ল দ্বারা সিপাহীদের কোম্পানীর সেনা না বলে ব্রিটিশ সরকারের সেনা হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে ব্রিটিশদের স্বার্থে তাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে কোন স্থানে যুদ্ধে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। এতে হিন্দু সৈনিকদের ধর্ম বি(্বাসে আঘাত হানে। তারা জাতিনাশের আশঙ্কা করে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে অকস্মাৎ এনফিল্ড রাইফেলের নতুন টোটা বা গুলি বা(দের স্তূপে অগ্নিসঞ্চার করে। এই নতুন ধরনের বন্দুক কোম্পানী সিপাহীদের মধ্যে প্রথম চালু করেন। এই বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার সময় সিপাহীদের দাঁত দিয়ে গুলি বা টোটার আচ্ছাদন ছিঁড়ে বন্দুকে ভরতে হত। আচ্ছাদনটিকে নরম রাখার জন্যে তা গ(ও শূয়ারের চর্বিতে ভেজান থাকত। এই দুটি প্রাণীর মাংস ছিল হিন্দু-মুসলিমদের নিকট নিষিদ্ধ খাদ্য। এর ফলে সিপাহীদের মনে ধর্মনাশ ও জাতিনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়। কলিকাতার উত্তরে ব্যারাকপুরের ছাউনিতে মঙ্গল পান্ডে নামে একজন ব্রাহ্মণ সিপাহী এজন্য উত্তেজিত হয়ে ১৮৫৭ খ্রীঃ ২৯ শে মার্চ তাঁর ঊর্ধ্বতন ইংরেজ অফিসারকে আত্র(মণ করেন। শু(হয়ে যায় সিপাহী বিদ্রোহ।

৪.৮ মহাবিদ্রোহের ইতিহাস

১৮৫৭ খ্রীঃ মহাবিদ্রোহের সূত্রপাত হয় প্রকৃতপ(কলিকাতার ১২ মাইল উত্তরে গঙ্গা তীরে ব্যারাকপুরের সেনা ছাউনীতে। যুবক সৈনিক মঙ্গল পান্ডে চর্বি মেশান কার্তুজের জন্যে উত্তেজিত হয়ে তাঁর ঊর্দ্ধতন ইংরেজ অফিসারকে আত্র(মণ করেন। ২৯ শে মার্চ, ১৮৫৭ খ্রীঃ মঙ্গল পান্ডের সামরিক আদালতে বিচারে ফাঁসী হয়। এরপর ২৩ শে এপ্রিল মীরাটের সিপাহী ছাউনীতে চর্বি মাখান কার্তুজ নিয়ে ৯০ জন সিপাহী অস্বীকার করায় তাদের ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। ১০ই মে ১৮৫৭ খ্রীঃ মীরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁদের বন্দী সহকর্মীদের মুক্ত(করে। ইংরেজ অফিসারদের হত্যা করে দিল্লী অভিমুখে রওনা হয়। মীরাটের সিপাহীরা দিল্লীতে এলে, দিল্লীর সিপাহীরা মেজর উইলেবিকে পরাস্ত করে দুর্গ ও অস্ত্রাগার দখল করে এবং দিল্লী নগরী দখল করে নেয়। দিল্লী ও মিরাটের সিপাহীরা বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট রূপে ঘোষণা করে। মুঘল সম্রাটকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করে ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্যের আদর্শকে তুলে ধরে। এরপর দিল্লী নগর বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রধান কেন্দ্রে পরিনত হয়। ত্র(মে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং জনসাধারন বিদ্রোহে সামিল হয়। অযোধ্যা, রোহিলখন্ড, দোয়াব, বুন্দেলখন্ড, মধ্য প্রদেশের গোয়ালিয়র, বিহারের বিরাট অংশ ও পূর্ব পাঞ্জাব নিয়ে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক স্থানে মানুষ সিপাহী বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশদের বি(দ্ধে তাদের (োভ প্রকাশ করে। বাহাদুর শাহের

ডাকে দেশীয় রাজারা সাড়া দেয় এবং তাদের হস্তচ্যুত (মতাকে হস্তগত করতে উৎসুক হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন কানপুরের নানাসাহেব এবং তার অনুচর তাঁতিয়া তোপী, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ এবং বিহারের কুনওয়ার সিং। বহুদিন বিদ্রোহের প্রতিরোধ গড়তে গড়তে ব্রিটিশদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। তথাপি শেষ পর্যন্ত আধুনিক রণকৌশল ও রণ পরিকল্পনা প্রয়োগ দ্বারা মহাবিদ্রোহীরা অবদমিত হয়। ১৮৫৭ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বর দিল্লীর পতন হয়। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে গ্রেপ্তার করা হয়। লেফটেন্যান্ট হডসন বাহাদুর শাহের দুই পুত্র ও এক পৌত্রকে গুলি করে হত্যা করেন। লখ্নৌ রেসিডেন্সীতে অব(দ্ধ ইংরেজ সেনারা হাতাহাতি যুদ্ধে আত্মর(া করে। হ্যাডলফও আউট্রাম রেসিডেন্সী উদ্ধারে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত প্রধান সেনাপতি স্যার কলিন ক্যাম্পবেল লখ্নৌ উদ্ধার করেন। নানাসাহেব পালিয়ে যান। ১৮৫৮-র ১৭ই জুন সেনাপতি ইউরোজ ঝাঁসীর রানীকে পরাজিত ও নিহত করেন। ১৮৫৮-৭ ১৯ শে জুন গোয়ালিয়রের পতন হয়। গোয়ালিয়রের পতনই মহাবিদ্রোহের সমাপ্তি ঘোষণা করে। বহু ভারতীয় প্রাণের বিনিময়ে পুনরায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের বুকে।

৪.৯ মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি

মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি বা চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঐতিহাসিক J Kaye (A History of the Sepoy War in India) এবং W. Malleson (History of the Indian Mutiny) এই বিদ্রোহের সামরিক চরিত্রের দিকেই গু(ত্ব আরোপ করেছেন এবং এনফিল্ড রাইফেলের প্রচলনকেই বিদ্রোহের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহের পশ্চাতে ভারতীয় জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করেছেন। এই সকল ঐতিহাসিকদের একমাত্র প্রচেষ্টা যে মহা বিদ্রোহের গু(ত্বকে খর্ব করা তা সহজেই অনুমেয়। Kaye এবং Malleson এই বিদ্রোহের চরিত্রকে একটি সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করতে চেয়েছেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় কয়েকজন ভারতীয় ঐতিহাসিকও এই বিদ্রোহের চরিত্রকে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বি(-ষণ করেছেন। R. C Mazumdar (The Sepoy Mutiny and the Revolt of ১৮৫৭ মন্তব্য করেছেন—এই বিদ্রোহ জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিলনা বরং একটি সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক ও সামরিক অভ্যুত্থান ছিল। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের (ে ত্রে মহাবিদ্রোহ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। S. Sen (Eighteen Fifty Seven) এই বিদ্রোহের সামরিক দিকটিকেই আলোকপাত করেছেন। Rajani Kanta Gupta (Sipahi Yuddher Itihas) এই বিদ্রোহকে প্রথম জাতীয়তাবাদী মহিমা দান করেন। তবে V. D/ Savarkar (History of the War of Independence) সর্বপ্রথম এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।

বর্তমান গবেষণায়রত ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করেছেন যে প্রাথমিকভাবে সিপাহী বিদ্রোহ হিসেবে শু(হলেও এটি একটি জনপ্রিয় চরিত্র ধারণ করেছিল। এই গবেষণার ভিত্তিতেই ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের অবতারণা হয়। একদল ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ বলতে আগ্রহী অন্যদল এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতার যুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। সম্ভবত এই দুটি চরমপন্থার মধ্যেই এই বিদ্রোহের আসল চরিত্র নিহিত আছে। প্রথমদিকে এই বিদ্রোহ ছিল কেবল সামরিক বিদ্রোহ। সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এই সামরিক অভ্যুত্থানের সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশ শাসনের বি(দ্ধে তাদের (ো ভ প্রকাশ করে। আমাদের হাতে প্রচুর প্রমাণ আছে যার সাহায্যে আমরা প্রমাণ করতে পারি কৃষকরা যেমন এই সুযোগে জমিদার ও মহাজনের বি(দ্ধে যুদ্ধ করেছিল, সাধারণ মানুষ সৈইরকম আইন আদালত, রাজস্ব ব্যবস্থা ও পুলিশী ব্যবস্থার বি(দ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। অন্যদিকে সাধারণ গ্রামবাসী ব্রিটিশদের বি(দ্ধে অস্ত্র ধারণও করেছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় এই বিদ্রোহ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে এ(ে ত্রে উল্লেখ্য প্রত্যেক জায়গায় এই বিদ্রোহের চরিত্র অনুরূপ ছিল না। Dr Rudrangshu Mukherjee দেখিয়েছেন অযোধ্যায় এই বিদ্রোহ একটি

জনপ্রিয় চরিত্র ধারণ করেছিল। পুরো উত্তর ভারতে এই বিদ্রোহের চরিত্র সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করা যায়। কিন্তু ভারতের অন্যান্য স্থানে এই বিদ্রোহ ততটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ ঘটনা যা এই বিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদী চরিত্র প্রদান করেছিল তা হল তাদের 'দিল্লী চলো' স্লোগান এবং মুঘল শাসনের প্রতি আনুগত্য। মুঘল সম্রাটকে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্যের আদর্শকে তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে বাহাদুর শাহও এই বিদ্রোহের প(াবলম্বন করতে দেশীয় রাজাদের অনুপ্রাণিত করেন। এই বিদ্রোহ যে গতিতে উত্তর ভারতে প্রসারিত হয়েছিল তার পরিপ্রে(তে মনে হয় যে একধরনের সাংগঠনিক ষড়যন্ত্র এই বিদ্রোহের পশ্চাতে লুকিয়েছিল। তথাপি স্বীকার করতে হয় বিদ্রোহী কোন স্পষ্ট রাজনৈতিক ধারণা ছিল না। এই বিদ্রোহে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা ছিল বিদ্রোহের নেতাদের সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র। ভারতীয় রাজারা যারা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল তারা সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছিল।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি, যদিও এই বিদ্রোহের একটি মিশ্রিত চরিত্র ছিল তবুও এর জাতীয়তাবাদী চেতনাটি ছিল খুব উজ্জ্বল। এমনকি এই বিদ্রোহের সামরিক, সামন্ততান্ত্রিক ও ঐতিহ্যিক চরিত্র জাতীয়তাবাদী চরিত্রের কাছে কিছুটা স্মিমিত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে ঐতিহাসিক গবেষণার মাধ্যমে একটি সত্য প্রকাশিত হয় যে যদিও এই বিদ্রোহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছিল তা সত্ত্বেও সারা উত্তর ভারতে এর ব্রিটিশ বিরোধী চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছিল।

৪.১০ ১৮৫৭-র বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ

১৮৫৭ খ্রীঃ এর মহাবিদ্রোহ প্রথম দিকে সফল হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। মহাবিদ্রোহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই বিফলতার কারণ জানা যায়। সামরিক দিক থেকে বিদ্রোহীদের বহু ভুল ত্রুটি হয়েছিল। বিদ্রোহীদের কোন সামগ্রিক পরিকল্পনা ও সংগঠন ছিল না। বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ শাসন ধ্বংস করার পর তার স্থলে কি ধরনের শাসন প্রয়োজন সে সম্পর্কে বিদ্রোহীদের কোন ধারণা ছিল না। বিভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন যোগ না থাকায় সংগঠিতভাবে বিদ্রোহকে পরিচালিত করা সম্ভব হয়নি। কোন সেনাপতির অধীনে সমগ্র রণ-পরিকল্পনা রচনা না করে ইতস্ততঃ ভাবে বিদ্রোহ করার ফল তাদের ভুগতে হয়। ব্রিটিশ সেনা পাল্টা আঘাত হানার সময় সিপাহীদের সামগ্রিক রণ পরিকল্পনা না থাকার সুযোগ নেয়।

বিদ্রোহীদের দিল্লী র(া করার ব্যর্থতার ফল ছিল মারাত্মক। দিল্লীর পতনের ফলে সিপাহী ও জনসাধারণের মনোবল ভেঙে যায়। বাহাদুর শাহ বন্দী হলে অনেকের কাছে বিদ্রোহ পরিচালনা করা নিষ্ফল বলে মনে হয়। কারণ বাহাদুর শাহ ছিলেন ভারতীয়দের স্বাধীনতার প্রতীক। যদি সিপাহীরা বাংলা ও পাঞ্জাব থেকে দিল্লী দখলের জন্য ইংরেজ সেনা আনা বন্ধ করতে পারত তাহলে এত সহজে দিল্লীর পতন হত না। বিদ্রোহী জনসাধারণ ও সিপাহীদের হাতে কোন উন্নতমানের অস্ত্র ও কামান না থাকায় ইংরেজ সেনার মোকাবিলা করা সহজ ছিল না।

বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন উপযুক্ত(নেতা বা সেনাপতি না থাকায় ইংরেজ সেনার মোকাবিলা করা অসম্ভব ছিল। বাহাদুর শাহ ছিল অ(ম অপদার্থ। নানাসাহেব প্রধানতঃ নিজ ব্যক্তি(স্বার্থকে জাতী স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান দিয়েছিলেন। ইংরেজ সেনাপতিরা যেরূপ শৃঙ্খলা ও মনোবল দেখান কোন বিদ্রোহী নেতার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতের এক বিরাট অঞ্চল বিদ্রোহ থেকে মুক্ত(থাকায় সেই সকল অঞ্চল থেকে সেনা ও রসদ এনে ইংরাজ শক্তি(যুদ্ধ চালাবার সুযোগ পায়। পশ্চিম পাঞ্জাব, বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বৃহৎ অংশ ছিল

বিদ্রোহ থেকে মুক্ত। দেশীয় রাজাদের অনেকে বিদ্রোহ থেকে দূরে থাকেন। তাঁরা ইংরেজের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে নিজ নিজ সিংহাসনের রক্ষার কাজকে সহজ করতে চেয়েছিলেন। সিন্ধিয়া বিদ্রোহে যোগ না দিয়ে ইংরাজ শিবিরে আশ্রয় নেন। নিজামও ইংরাজের প্রতি আনুগত্য দেখান। জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজ বিরোধিতা থাকলেও বেশীর ভাগ দেশীয় রাজাদের স্বার্থপর দাস মনোবৃত্তি বিদ্রোহীদের উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত করে। এছাড়া ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীও বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি দেখায় নি। জমিদার, মহাজনরা বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ছিল। ভারতীয়দের এই অনৈক্য বিদ্রোহের পতন ঘটায়।

মোটকথা বিদ্রোহের লক্ষ্য স্থির থাকলে অনেক বেশী মানুষ অনুপ্রাণিত হত। তারা মরণপন লড়াই করত। কিন্তু লক্ষ্য বিচ্যুত বিদ্রোহ মানুষের মনে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারেনি।

৪.১১ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের গুরুত্ব

১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহ ছিল বহুক্ষেত্রে নতুনের বিরুদ্ধে পুরাতনের বিদ্রোহ। Sir Lepel Griffen মন্তব্য করেছেন— "The Revolt of 1857 swept the Indian sky clear of many clouds." একাধিক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ পরিবর্তন আনয়ন করেছিল **প্রথমতঃ,** ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতীয়দের শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। ভারতীয়দের প্রতি অনেক বেশী সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন, বিশেষত সেই সকল প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর প্রতি যারা জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। ভারতবাসী ধর্মীয় চেতনা যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় ব্রিটিশরা সে বিষয়ে সচেতন হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই বিদ্রোহের তিক্ততা যত প্রমাণিত হতে থাকে তত মানুষের মন থেকে ঐতিহ্যিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি টান আলগা হতে থাকে। দিগন্তে, জাতীয়তাবাদের সুর্যের উদয় স্পষ্টতর হতে থাকে। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষরা এদেশীয় দুঃখ দুর্দশার প্রতি সচেতন হতে থাকে। রাজা মহারাজদের আধিপত্যের স্থান দখল করে পশ্চিমী আলোকপ্রাপ্ত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।

তৃতীয়তঃ, ব্রিটিশরা বুঝতে পারে যে তাদের শাসন পদ্ধতির নিশ্চিত কিছু ত্রুটির জন্যেই এই বিদ্রোহের প্রকাশ। সুতরাং তারা ত্রুটি সংশোধন করতে উদ্যোগ নেয়। ব্রিটিশরা বুঝতে পারে ভারতের মত বৃহৎ দেশের শাসনভার ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। ভারত থেকে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার খর্ব করা হয় এবং ভারতকে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের আওতায় আনা হয়। ১৮৫৮ খ্রীঃ এর ভারতশাসন আইনের মাধ্যমে এই পরিবর্তন সাধিত হয়। এই আইনের মাধ্যমে ভারতে গভর্নর জেনারেল ভাইসরয় হিসেবে পরিচিত হয়। এছাড়াও বলা হয় যে সরকারের চাকুরীতে জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগের নীতি নেওয়া হবে। আই-সি-এস চাকুরীতে নিয়োগের জন্যে ১৮৬১ খ্রীঃ এক আইন দ্বারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগের নিয়ম চালু করা হয়। ব্রিটিশ শাসন আগের থেকে অনেক বেশী প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

চতুর্থতঃ, যাতে দেশীয় রাজারা ভবিষ্যতে ব্রিটিশ বিরোধী না হয়ে ওঠে সেজন্যে ভেদনীতি খাটিয়ে দেশীয় রাজাদের রাজ্য রক্ষা, তাঁদের মর্যাদা ও খেতাব রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করা হয়। এমনকি অযোধ্যার তালুকদারদের ও তালুক ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এঁরা ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সম্রাটের একনিষ্ঠ অনুগত প্রজার ভূমিকা পালন করেন।

সর্বোপরি পার্সিভ্যাল স্পীয়ারের মতে মহাবিদ্রোহের দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিভেদ রেখা স্পষ্টতর হতে থাকে। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা জাতি বৈষম্যের নীতি নেয়।

ইংরেজ শাসকরা এবার 'গাজর এবং লাঠি'-র (Carrot and Sticks) দ্বৈত নীতি গ্রহণ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে অনুমোদন এবং দমনের নীতি গ্রহণ করে। তারা এইরূপ ভাবমূর্তি প্রকাশ করতে চেয়েছিল যে তাদের সকল নীতি জনসাধারণের কল্যাণার্থে গৃহীত হয়। তাদের অনুমোদন নীতি প্রতিফলিত হয় ১৮৬১ তে 'Indian Council Act' পাশের মধ্যে দিয়ে, যার মাধ্যমে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে কিছু মনোনীত ভারতীয়দের নিয়োগ করা হয়, বি(বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শি(ার অগ্রগতি সূচিত হয়। Penal Code বা ভারতীয় দন্ড আইনের প্রচলন করা হয়। তথাপি মহাবিদ্রোহের ফলে মানুষের জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়। এখন থেকে জাতীয়তাবাদী প্রতিত্রি(য়ার (ে ত্রে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী উদ্যোগ নেয়। ফলে ইংরেজ শাসকশ্রেণী সচেতন হয় এবং জাতীয়তাবাদ প্রশমনের তাগিদে 'Divide and Rule' বা ভারতীয়দের মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ দ্বারা অনৈক্য সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদকে কায়েম করার নীতি নেয়। এই ভেদ নীতির মাধ্যমে মহাবিদ্রোহের সময় হিন্দু মুসলিমের দৃঢ় ঐকে চিড় ধরে। এবং ত্র(মশ সেই চিড় ভাঙনে পরিণত হয়।

১৮৫৭-র বিদ্রোহ আপাত দৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও এই বিদ্রোহের সুদূর প্রসারী ফল স্বরূপ জাতীয় আন্দোলনের (ে ত্রে প্রস্তুত হয়ে যায়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মাধ্যমে একটি যুগের অবসান হয় এবং একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। যে যুগ অনুধাবন করে আধুনিকতাকে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এখানেই ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের তাৎপর্য নিহিত। সাভারকার তাই মহাবিদ্রোহকে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মর্যাদা দিয়েছেন।

৪.১২ গ্রন্থপঞ্জি

1. Sumit Sarkar — Modern India.
2. Bipan Chandra — India's Struggle for Independence.
3. Dipak Kumar Aich — Emergence of Modern Bengali Elite.
4. R. Chakrabarti — Authority & Violence in Bengal.

৪.১৩ অনুশীলনী

১. সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ লেখ।

২. মহাবিদ্রোহের উৎপত্তির কারণ আলোচনা কর।

৩. মহাবিদ্রোহ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে মতবিরোধ আছে তা আলোচনা কর।

৪. মহাবিদ্রোহের ঐতিহাসিক গু(ত্ব লেখ।

একক ৫ ❑ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা

গঠন

৫.০ প্রস্তাবনা
৫.১ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
৫.২ রায়তওয়ারী ব্যবস্থা
৫.৩ মহলওয়ারী বন্দোবস্ত
৫.৪ গ্রন্থপঞ্জি
৫.৫ অনুশীলনী

৫.০ প্রস্তাবনা

বাংলা জয় করার পর লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনাধীনে প্রত্য(শাসন চালু করার মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ সরকার তাদের দৃষ্টি ফেরায় ভূমি রাজস্বের সর্বাধিকরণের দিকে। রাজস্বের সুর(া ব্রিটিশ সরকারের কাছে অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ ছিল, কারণ একদিকে শাসনব্যবস্থা ও অন্যদিকে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় সামরিক অভিযান চালানোর জন্যে। মূলগতভাবে যা প্রাথমিকভাবে ভারতবর্ষ তার চরিত্রের দিক থেকে কৃষিপ্রধান এবং কৃষিকার্য হচ্ছে জনগণের প্রাথমিক কাজ বা জীবিকা। যদি ভারতবর্ষ শোষিত হতো তাহলে এর পিছনে সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ কারণ ছিল গ্রামীণ উদ্বৃত্তের সর্বাধিক নিয়্যাস শোষণ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় সরকার অতঃপর সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা নিয়েছিলো ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তের, বাংলার (ে ত্রে এটি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ সালে জমিদারের সঙ্গে। প্রধানত এর উদ্দেশ্য ছিল রাজস্বের সুর(া এবং গ্রামীণ অভিজাতদের একত্রিত করা। জমিদারদের এই ভাবনার প(ে আনয়ন করা।

৫.১ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

জমিদারীর নির্ধারিত সর্বোৎকৃষ্ট মূল্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার পর, বস্তুত, ভূমি রাজস্ব পৌঁছেছিল সার্বিক মূল্যের ১১ ভাগের ১০ ভাগে। কিন্তু ওটি স্থায়ীভাবে নির্ধারিত ছিল। তথাপি জমিদারগণ রাজস্ব দিতে বাধ্য ছিল যথাসময়ে বা নির্দিষ্ট দিনে চুক্তি(অনুসারে, সূর্যাস্ত আইন হিসেবে সূর্য ডোবার আগে। এই ভয়ানক কঠোর আইনের ব্যাপারে পুরোনো স্থায়ী জমিদারগণ ছিলেন অনভ্যস্ত। ফলে তাঁরা ত্র(মশ আইনের খেলাপকারী হয়ে উঠলেন, এবং তাঁদের জমিদারী নিলামে বিক্রি(হয়ে গেল, নতুন প্রজন্মের জমিতে অনুপস্থিত ভূস্বামীদের হাতে। যারা সংগ্রহ করতো সর্বাধিক রাজস্ব তাদের নায়েব গোমস্তা এবং লাঠিয়ালদের সাহায্যে, গরীব রায়তদের কাছ থেকে। এ-ব্যাপারে সরকার তাদের সবরকম ছাড় দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরে, রাজস্বের সুর(া ছিল একটি চরম প্রয়োজন, কিন্তু ১৮২০'র দশকে, সরকার ত্র(মশ (তিগ্রস্থ হচ্ছিল এবং নতুন ভূস্বামী শ্রেণী লাভবান হয়েছিল কেন না অনুপার্জিত বৃদ্ধির ফলে, সংশোধনের কারণে এবং জমির চাহিদা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বেড়ে গিয়েছিল।

বহু বড় জমিদার'রা যেমন, বর্ধমানের মহারাজা তাঁর রাজ্যকে উপ-জায়গীরে বিভক্ত(করেন আর সৃষ্টি করেন

একধরনের মধ্যস্বত্বভোগী ভূস্বামীদের। যারা পরিণত হয়েছিল পরজীবীতে। সমগ্র জমির আসল সরটাই তারা খেয়ে নিচ্ছিল। এদের বেশীরভাগই অসৎপথে উপার্জিত টাকা-পয়সা কলকাতা শহর কিম্বা জেলা শহরগুলিতে গিয়ে, নানা আমোদ-প্রমোদের মধ্যে দিয়ে ব্যয় করে ফেলত। যাইহোক জমিদাররা কখনই পুরোপুরি তাদের মালিকানা স্বত্ব বা অধিকার সূর্যাস্ত আইন, ভাড়ামুক্ত(রায়তী স্বত্বের পুর্ণাগ্রহণ, অতিশক্তি(শালী নীলকর সাহেবদের বলপ্রয়োগ, পরবর্তী সময়ে গৃহীত ভাড়া, প্রজাস্বত্ব আইনের জন্য উপভোগ করতে পারতো না।

সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো যথার্থ রায়তদের ওপর প্রচণ্ডভাবে ভেঙে পড়েছিল, এবং যারা নি(প্ত হয়েছিল অনাহারের ভূমিতে, রায়তরা শেষ পর্যন্ত মহাজনের কাছ থেকে সুদে টাকা নিয়েছিল জমিদারকে দেওয়ার জন্য এবং ত্র(মে এই রায়তরা পরিণত হয়েছিল ভূমিহীন ভাগচাষী ও কৃষিশ্রমিকে। এদের এই দুর্দশা নানাভাবে বর্ণিত হয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। এঁদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্যরা ছিলেন অ(য়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং রমেশচন্দ্র দত্ত। উনিশ শতকের শেষদিকে একটা সময় এলো, এমনকি যখন জমিদার'রা ত্র(মশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাদের সম্পত্তি বিভক্তি(করণের ফলে আর রায়তরা উপবাসে কষ্ট পাচ্ছিল এবং যখন কোনরকম উন্নতি পরিল(ত হচ্ছিল না কৃষিকার্যের (ত্রে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পিছনে যে উন্নতির যুক্তি(ছিল, তা এইভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, পরবর্তীকালে এটি ছড়িয়ে পড়েছিল উড়িশা, উত্তর সরকার, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে, একই পরিণতিতে।

৫.২ রায়তওয়ারী ব্যবস্থা

ব্রিটিশরা তাদের রাজস্ব নীতি সুবিন্যস্ত করেছিল মূলতঃ প্রত্যেকটি অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক কাঠামোর চরিত্রকে মাথায় রেখে। ব্রিটিশরা সন্ধান পেয়েছিল দ(ণ এবং দ(ণ-পশ্চিম ভারতের কোনও জমিদার-ই বিরাট জমিদারীর মালিক নয়। যাদের সঙ্গে ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত যথার্থভাবে হতে পারে। অধিকন্তু সরকারও ততটা জোরালো ভাবে আরোপ করেনি কোনও রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত কৃষি কাঠামোর ওপর। বাংলার (ত্রে সরকার রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুর(ার জন্য চিরস্থায়ীতে পরিণত করে। নতুন নিয়মে জমিদাররা অতিত্র(ম করতে পেরেছিল সূর্যাস্ত আইনের আঘাত এবং শু(করেছিল অনুপার্জিত রাজস্ব বৃদ্ধি উপভোগ করতে, যেখানে সরকারী ঈর্ষা পরিল(ত হয়। যে রাজস্ব তারা বেঁধে দিয়েছিল ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় তাকে হ্রাস করার কোনও ইচ্ছা সরকারের ছিল না।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির পুরনো রাজস্ব কর্মচারীরা যেমন, রীড এবং মুনরো দেখেননি কোনও বাংলার জমিদারদের মতো গ্রামিণ অভিজাতদের এবং তারা সুপারিশ করেছিলেন যে, ওই ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত করা হবে প্রকৃত কৃষক ও রায়তদের সঙ্গে। ১৮০৫ সালের বন্দোবস্ত অনুসারে রায়তরা চিহ্নি(ত হয়েছিল তার নিজের জমির মালিক হিসেবে আর তারা দায়ী থাকতো ঠিক সময়ে রাজস্ব দেওয়ার ব্যাপারে, অর্থাৎ রাজস্বের পরিমাণ যেটা দিতে হবে তা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত ছিল না এটা ছিল একটা পর্যায়ত্র(মিক বিষয় এবং মোট উৎপাদনের ৪৫% থেকে ৫৫% সরকারের দাবী ছিল। রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় ১২ বছর অন্তর অন্তর। ব্যাপারটা ছিল গ্রামীণ উদ্বৃত্তকে ধ্বংস করে দেবার প্রচেষ্টা এবং সরকার ত্র(মেই প্রকৃত জমিদার হয়ে ওঠে। কৃষকদের কোনওরকম ছাড় ছিল না প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কম শস্য সংগ্রহের জন্য। বার্নস্টেনের আত্মজীবনীতে পাওয়া যায় যে এটি কোনওভাবেই কৃষকদের প(র বন্দোবস্ত ছিল না আর মুনরো'ও কোন সাধুপু(ষ ছিলেন না, পারিয়াররা ত্র(মেই হয়ে উঠেছিল ভূমিদান।

সেচ ব্যবস্থার ব্যাপারে সরকারের খুব কমই অবদান ছিল। এটা কৃষক সম্প্রদায়ের চরম দুরবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। একমাত্র ধনী কৃষকরাই আরও সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল। বৃটিশ রাজত্বের (ত্রে তারাই হয়ে উঠেছিল নগদ শস্যের প্রধান কারবারী।

এই একই পরিপ্রে(তে ১৮২০-'র পরবর্তী সময় গভর্নর জেনারেল এলফিনস্টোনের শাসনকালে এই পদ্ধতি বোম্বে প্রদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। মহাজনরা গবীর কৃষকদের নিজেদের আওতায় নিয়ে এসেছিল সরকারী খাজনা অগ্রিম দেওয়ার মধ্যে দিয়ে চড়া সুদে।

৫.৩ মহলওয়ারী বন্দোবস্ত

মহলওয়ারী পদ্ধতি ছিল মহল ভিত্তিক বা জমিদারী ভিত্তিক ব্যাবস্থা, যা কিনা উত্তর পশ্চিম প্রদেশগুলি মধ্যভারত এবং পঞ্জাবে দেখা গিয়েছিল। ভায়চারা গ্রামীণ ঐতিহ্যের ওপর যা দাঁড়িয়েছিল। এই অঞ্চলগুলিতে ১৮২৩-১৮৩৩ এবং ১৮৫০ সালের মধ্যে প্রথম দুটি এবং শেষেরটি। এখানে চুক্তি(টা দেখা গিয়েছিল গ্রাম প্রধানের সঙ্গে, যাঁকে গ্রামের প(থেকে রাজস্বের একটি বড় অংশ সরকারকে দিতে হতো, যা কিনা পর্য্যায়ত্র(মে উৎপাদনের ভিত্তিতে পুনরায় দিতে হতো। এই সকল গ্রামপ্রধানরা তাদের (মতার অপব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে গরীব কৃষকদের সঙ্গে প্রতারনাও করতো। এরা খুব দ্রুত মহাজনদের ফাঁদে পড়ে নিজেদের জমি থেকে উৎখাত হয়ে যেত।

নগদ অর্থের বন্ধনে এই নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা দরিদ্র কৃষকদের জড়িয়ে ফেলেছিল। যে টাকা তাদের ভাড়া হিসেবে দিতে হতো, তা তারা সংগ্রহ করতো অত্যন্ত চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে। যদি তারা ব্যর্থ হতো মহাজন অথবা সরকারকে ধার শোধ করতে কিংবা খাজনা দিতে, ফলস্বরূপ জমি থেকে উৎখাত হতে হতো, এই পদ্ধতিতেই ভূমিহীন ভাগচাষী এবং কৃষিশ্রমিকদের জন্ম হয়েছিল ভারতবর্ষে। ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যাবস্থা পুরোপুরি সরিয়ে দিয়েছিল মুঘল যুগের সমগ্র উপশম বা যন্ত্রনার লাঘবকে, পরম্পরাগত দুঃর্ভি(, অনাহার, (ুধা কৃষকদের উপর এসে পড়েছিল।

৫.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. বি. এইচ. ব্যাডেন পাওয়েল—দি ল্যান্ড সিস্টেমস্ অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া
২. সিরাজুল ইসলাম—পারমানেন্ট সেটলমেন্ট ইন বেঙ্গল
৩. চিত্তব্রত পালিত— টেনশনস্ ইন বেঙ্গল (র‍্যাল সোসাইটি
৪. নীলমনি মুখার্জি—দি রায়তওয়ারি সেটলমেন্ট ইন ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সী
৫. বারটেইন স্টেইন—থমাস মুনরো
৬. আসিয়া সিদ্দিকী—ল্যান্ড রেভেনিউ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ইউ পি
৭. ই হোয়াইট কম্ব—আগ্রারিয়ান কনডিশন ইন নর্থ ইন্ডিয়া
৮. হিমাদ্রি ব্যানার্জী—অ্যাগ্রারিয়ান সোসাইটি অব পঞ্জাব
৯. এম. ডাবলিং—পঞ্জাব পেজেন্ট ইন প্রপার্টি অ্যান্ড ডেট
১০. আর. কুমার—ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ইন দ্যা নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি
১১. সুনীল সেন—অ্যাগ্রারিয়ান রিলেশন্স ইন ইন্ডিয়া

৫.৫ অনুশীলনী

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেন জমিদারদের ওপর আরোপ করা হয়? এবং কৃষকদের ওপর এর প্রতিক্রি(য়া কি ছিল?

২. রায়তওয়ারী ব্যবস্থার পটভূমিকা এবং শর্ত-আরোপন (Background & Provisions) কি ছিল এবং কৃষকদের ওপর এর প্রতিক্রি(য়া কি ছিল?

৩. মহলওয়ারী ব্যবস্থা কি? এবং তা কি ভাবে N.W.P এবং Punjab এর কৃষকদের প্রভাব ফেলে?

৪. বম্বের রায়তওয়ারী ব্যবস্থা কি ভাবে গ্রামীণ ঋণভার (rural indebtedness) বাড়িয়ে দিয়েছিল?

একক ৬ ❑ কৃষক বিদ্রোহ

গঠন

৬.০ ভূসম্পত্তি বিষয়ক নীতিসমূহ, কৃষক এবং উপজাতি আন্দোলন সমূহ
৬.১ নীল বিদ্রোহ
৬.২ পাবনা বিদ্রোহ
৬.৩ ডেকান বিদ্রোহ
৬.৪ সাঁওতাল বিদ্রোহ
৬.৫ মুন্ডা আন্দোলন
৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি
৬.৭ অনুশীলনী

৬.০ ভূসম্পত্তি বিষয়ক নীতিসমূহ, কৃষক এবং উপজাতি আন্দোলন সমূহ

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভূমি রাজস্বের আয়কে সুনিশ্চিত করেছিল ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে, কিন্তু এর বেশীরভাগটাই ব্যয়িত হয়েছিল প্রশাসন ও মূলধন, এবং সামরিক অভিযানের (ে ত্রে। কিন্তু সেখানে ছিল না কোনও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিধিসমূহ, লাভজনক ব্যবসার জন্য একমাত্র আফিম এবং লবণের একচেটিয়া ব্যাবসা ছাড়া। সরকার স্থির করেছিল লাভজনক ব্যবসার জন্য অন্য কোন লগ্নিকরণের সন্ধান। নীল ছিল এমন একটি শস্য যার চাষ ইংলন্ড থেকে আসা বেআইনী নীলকর সাহেবদের দ্বারা অপরাধজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মুক্ত(-বাণিজ্য প্রসারের প(াবলম্বীদের নেতৃত্বে ১৮৩৩ সালের সন্দ আইন সংশোধিত হয়, যা কিনা মুছে দেয় কোম্পানীর ব্যাবসায়িক কর্মকান্ডএবং অনুমতি দেয় মুক্ত(বাণিজ্যের ব্যবসায়ীদের ভারতে ঢুকতে ব্যক্তি(গত উদ্যোগের জন্য। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের উপযোগিতাবাদী প্রশাসন (১৮২৪-৩৬) এরই মধ্যে ১৮৩০ সালে স্থির করেছিল বাংলায় নীলকরদের অনুমতি দেবে। যেভাবে তারা গঠন করে একধরনের উন্নতিচত্র(। ১৮৩৪ সালের মধ্যে যেখানে তারা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে প্রত্যন্ত বাংলায়। তারা অনুমতি পেয়েছিল জমিগুলিকে পিতা থেকে পুত্র পর্যন্ত তাদের নিজেদের নামে ধরে রাখতে। এটি সৃষ্টি করেছিল লগ্নিকরণের আবহাওয়া এবং নীলকর সাহেবরা তাদের ব্যবসার মূলধন সংগ্রহ করেছিল ব্যঙ্ক অব বেঙ্গল আর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কোম্পানীর কর্মচারীদের সঞ্চিত অর্থ আর ব্রিটিশ এজেন্সী হাউসগুলি থেকে।

৬.১ নীল বিদ্রোহ (১৮৬০)

ব্যবসায়ী কৃষির (ে ত্রে নীল ত্র(মশ একটি সমৃদ্ধশালী দিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৮০০ থেকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। নীল গাছগুলি ছিল সূতি বস্ত্র নীল রঙয়ে ছোপানোর (ে ত্রে একটি প্রাকৃতিক উৎস। এই বিশাল নীল ব্যবসা খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত(ছিল ইংলন্ডের দ্রুত বেড়ে ওঠা সুতি বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে, যা কিনা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে এবং বিবেচনা অনুযায়ী ৪৬% মূল্যের জিনিসপত্র রপ্তানী করা হতো কলকাতা থেকে। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৫ সালের মধ্যে নীল ছিল জমিদার এবং রায়তদের কাছে আর্শীবাদের মতো, কেন না নীলকররা এর জন্য জমিদারদের প্রচুর ভাড়া দিত এবং রায়তরাও নীলের চাষ করবার জন্য ভালো অর্থ পেত। কিন্তু ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে

নীলের চাহিদা ইওরোপীয় বাজারে প্রচন্ডভাবে পড়ে গেল আর অবিক্রি(ত প্রচুর পরিমাণ নীল গুদামে পচতে থাকলো। নীলকররা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক'কে তাদের ধার শোধ করতে ব্যর্থ হলো এবং ১৮৪৭ সালে এটি বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই দিন থেকেই নীলকর সাহেবদের অত্যাচার শু(হ'ল রায়তদের ওপর, যাতে তারা নীলচাষ করে, এবং অর্থ ছাড়াই তাদের এই চাষ করতে বাধ্য হয়ে হয়। নীল জোর করে এমনকি ধানের জমিতেও ব পন করা হতে লাগলো। নীল চাষের সঙ্গে ধান উৎপাদনের সংঘর্ষ শু(হলো। যা ছিল এই সময় অনেকবেশী লাভজনক। নীলকররা কৃষি কাঠামোর ওপর সবরকম আত্র(মণ নামিয়ে আনলো। বেআইনীভাবে রায়তদের বন্দী করে রাখা(শারিরীক অত্যাচার করা, কারখানা ও গুদামঘরে শিশু ও নারীপীড়ন, লুটপাঠ, ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া এই সমস্ত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নীলকররা তাদের সন্ত্রাসের রাজত্বে কায়েম করেছিল। সরকার কিন্তু তখনও এই সমস্ত নীলকরদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশকর্তারা সমস্ত ব্যাপারে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আর একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। গ্রামীণ সমাজের সমস্ত শ্রেণী বিরক্ত(হয়ে উঠেছিল। এই নীলকর ও জমিদারদের বি(দ্ধে তাদের কর্তৃত্বকে ধ্বংস করার জন্য। ছোট জমিদার, জোতদার অথবা বৃহৎ চাষীরা নীলকরদের মুখোমুখি হয়েছিল তাদের নিজেদের ধান উৎপাদনের জন্য, আর রায়তরা একত্রিত হয়েছিল তাদের ওপরে অমানুষিক অত্যাচার নেমে আসার জন্য। তারা একত্রিত হয়েছিল বৈদেশিক শক্তি(কে বাংলা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য। শহুরে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তাদের মুখপত্র হিসেবে যে পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে নিজেদের দাবি দাওয়া উপস্থাপিত করেছিল সেগুলি হল—হিন্দু পেট্রিয়ট, অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গল ম্যাগাজিন ইত্যাদি। দীনবন্ধু মিত্র লিখিত নীলদর্পণ নাটক নীলকরদের স্বৈরাচারের আয়না হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছিল আর সমগ্র মধ্য শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। বস্তুত মধুসূদন দত্ত এটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন বৃটিশ কর্তৃপ(র নজরে আনার জন্য। কিন্তু কারাবাস করেছিলেন বইটি প্রকাশনার জন্য রেভারেন্ড লং। যেমন, মনস্বী শিশির ঘোষ আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন তাঁর ''কৃষক বিদ্রোহের গল্প''। বিষু(চরণ ও দিগম্বর বি(াস ছিলেন বাঁশবেড়িয়ার নীলকর সাহেব জন হোয়াইটের কর্মচারী। যাঁরা ধান চাষ ও ব্যবসা করে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিলেন এবং নদীয়ায় যে বিদ্রোহ শু(হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে এসেছিলেন। নড়াইলের জমিদার রামরতন রায় রানাঘাটের পালচৌধুরী, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ(মুখার্জি প্রমুখ জমিদারদের পৃষ্ঠপোষনায় এই বিদ্রোহ শু(হয়েছিল।

রায়তরা উৎসাহিত হয়েছিল অস্ত্র ধারণ করতে নীলকরদের বি(দ্ধে, যখন তারা শেষপর্যন্ত রায়তদের বাধ্য করেছিল ধানের জমিতে নীল বুনতে। অতঃপর সরকার তাঁর মনোভঙ্গি পাল্টে ছিল কৃষকদের সম্বন্ধে এবং একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছিল রায়তদের ইচ্ছার বি(দ্ধে নীলচাষ করানোর চেষ্টা হলে তারা তা প্রত্যাখান করতে পারে। ইডেন বিজ্ঞপ্তি ছিল সেই স্ফুলিঙ্গ যা অগ্নি প্রজ্বলনে সাহায্য করেছিল। রায়তরা এই সময় থেকে নীলের চুক্তি(প্রত্যাখ্যান করতে শু(করলো এবং যৌথভাবে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে নীলকরদের বি(দ্ধে আন্দোলন শু(করলো। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মশাররফ্ হোসেন, ডেপুটি এবং সহযোগী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং গিরীশ ঘোষ দারোগা হিসেবে বিদ্রোহের সময় প্রচুর নীলকরকে গ্রেফতার করেছিলেন। সরকার শেষপর্যন্ত এই বিদ্রোহ শান্ত করেন এবং বুদ্ধিজীবীদের দাবীদাওয়াকে কিছুটা মেনে নিয়েছিলেন, যেমন এঁদের মধ্যে ছিলেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮৬০ সালে ইন্ডিগো কমিশন বসে, যারা নীলচাষীদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে সম্যক অনুসন্ধান শু(করেন এবং এঁদের রিপোর্টে বা প্রতিবেদনে নীলচাষ এবং নীলকরদের বি(দ্ধে অভিযোগ আনা হয় আর সেইসঙ্গে রায়তদের মুক্তি(র কথা বলা হয়। ইংরেজ আগমনের পর বাংলার প্রথম কৃষক বিদ্রোহ বলে শিশিকুমার ঘোষ একে সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। একই সঙ্গে সরকার এবং জাতীয়তাবাদী এই বিদ্রোহ থেকে ইঙ্গিত পেয়েছিলেন, কৃষকদের একত্রিত করার (ে ত্রে।

অতঃপর নীলকর সাহেবরা বাংলা ছেড়ে উত্তর বিহারে সহজে বশ করা যায়, এমন কৃষকদের মধ্যে কাজ শু(করে।

৬.২ পাবনা বিদ্রোহ (১৮৭৩)

নীল বিদ্রোহ জেগে ওঠার পর, সরকার ১৮৫৯ সালের ভাড়া আইন পাস করেছিল। যা কৃষকদের ১২ বছরের অধিকারকে র(া করেছিল এবং যেটি আকস্মিক ভাড়া বৃদ্ধির ওপর দাঁড়িয়েছিল। জমিদারগণ এই প্রতিদ্বন্দ্বীতাকে গ্রহণ করেছিলো নানান কৌশলের সাহায্যে। ধনী কৃষকরা আইনী যুদ্ধে জমিদারদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং বহু মামলায় জয়লাভ করে জমিদারদের বি(দ্ধে। কার্য(ত্রে এটি অতি দ্রুত জ্বলে উঠেছিল। এই কৃষক বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র ছিল পাবনা জেলা। সংশোধনের জায়গা হিসেবে জমিদারগণ ভাড়া কমিয়ে দিয়েছিল(এই বন্দোবস্তের কালে। কিন্তু এটির নির্মাণ ঘটেছিল অতিরিক্ত(ভাড়া বা মাশুলের চাহিদার জন্য। এই পথ বন্ধ হয়েছিল লেঃ গভর্নর জর্জ্জ ক্যাম্বেলের ১৮৬৯ এর সিদ্ধান্তে। যা আবওয়াব নামক করটিকে মুছে দিয়েছিল। পাবনার জমিদাররা যেমন ব্যানার্জী, ঠাকুর, সান্যাল, ভাদুড়ী'রা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভাড়ার সঙ্গে আবওয়াবকে একত্রিত করতে এবং স্থির করেছিলেন নতুন ভাড়া যা ৬ গুণ বেশী পুরনো ভাড়ার তুলনায় রায়তরা এই বর্ধিত ভাড়া দিতে অস্বীকার করেছিল। ভাড়া বৃদ্ধি মামলা-মকদ্দমার (ে ত্রে ভয়ানক— অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। এবং বিহারের (ে ত্রেও বিলম্ব হচ্ছিল। জমিদাররা বলপ্রয়োগ করছিল নতুন ভাড়া সংগ্রহের জন্য। কৃষি সংগ্রহের মধ্য দিয়ে রায়তরা সংগঠিত হয়ে উঠেছিল। যা মামলা-মকদ্দমার (ে ত্রে রায়তদের সচেতন করে তুলেছিল জমিদারদের বি(দ্ধে। নতুন প্রজন্মের মুক্তি(য়ার্সরাও আসলে ছিল (ু দ্র ভূস্বামী এবং পাট ব্যবসায়ীরা তাদের মামলা গ্রহণ করেছিল অর্ধেক মূল্যে এবং ঈশানচন্দ্র রায় এঁদের মধ্যে একজন যিনি ক্র(মশ হয়ে উঠেছিলেন বিদ্রোহী রাজা বা প্রধান নেতা। ব্যানার্জীর সঙ্গে রায়ের সংঘর্ষ বাধল জমির বিবাদকে কেন্দ্র করে এবং তিনি শপথ নিয়ে বিদ্রোহ সংগঠিত করতে লাগলেন। কৃষকরা একত্রিত হয়েছিল ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে জমিদারদের লাঠিয়ালদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। আইন শৃঙ্খলা সুর(ার জন্য সরকার বহু সময় মধ্যস্থতা করেছিলেন, এই ধরনের প্রচুর যুদ্ধ-বিগ্রহের পরে। কিন্তু আইনত যুদ্ধ চলতেই থাকে। অর্থবান কৃষকরা পাটের ব্যবসা থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ লাভ করে। জমিদারদের বি(দ্ধে শেষ বিন্দু পর্যন্ত তারা তাদের মকদ্দমা চালিয়ে গিয়েছিল। প্রায় সমস্ত জমিদাররাই শেষ পর্যন্ত এদের সঙ্গে আপস করেছিল। একমাত্র ঈশানচন্দ্র ব্যানার্জী ছাড়া। পাবনা বিদ্রোহ ছিল একটি অমীমাংসিত খেলা।

এই বিদ্রোহ রেখে গিয়েছিল শোষিত কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য মূল্যবান শি(া। কৃষক সংঘ অথবা রায়ত সভাগুলি গড়ে উঠেছিল নানা জেলায়। মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিদ্‌রা খুব দ্রুত এদের সংযুক্ত(করে নিয়েছিল, তাদের নতুন গঠিত রাজনৈতিক কাঠমো 'ভারতসভা'র মধ্যে। তাঁরা দৃঢ়রূপে রায়তদের সঙ্গে যুক্ত(হয়েছিল এবং তাদের জন্য অত্যাচারী জমিদারদের বি(দ্ধে লেখালেখি করছিল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুরোধা ব্যক্তি(রা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং সঞ্জিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রেভারেন্ড লাল বিহারী দে এবং অভয়চরণ দাস। আর.সি দত্ত সরাসারি ভাবে পাবনা বিদ্রোহীদের জমিদারদের বি(দ্ধে লড়াইকে সমর্থন করেছিলেন 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় যা লালবিহারী দে'র দ্বারা পরিচালিত ছিল। ভারত সভা এইভাবে আরও বড়ো অবস্থায় পরিনত হয়েছিল এবং তারা বেরিয়ে এসেছিল ব্রিটিশ ভারতসভার ভূমি রাজনীতি থেকে। সেইসঙ্গে তারা তুলে ধরেছিল অন্যান্য জনমত সম্পর্কিত প্রতিনিধিত্বের বিষয়গুলিকে।

৬.৩ ডেকান বিদ্রোহ (১৮৭৫)

ডেকান বিদ্রোহ (১৮৭৫) ছিল ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব ব্যাবস্থা এবং সুদখোর মহাজনদের (াস(দ্ধকারী অবস্থার বি(দ্ধে আর একটি শক্তি(শালী কৃষকবিদ্রোহের উদাহরণ। এলফিনস্টোন গভর্নর থাকাকালীন সময়ে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল ডেকানে, যা কিনা ধনী কৃষকদের উত্থানে সাহায্য করেছিল। যেমন— বাংলায়, যেখানেও ব্রিটিশ নীতি

ছিল রাজস্ব বাড়িয়ে তোলা এবং রায়তদের ঠেলে দেওয়া, মূল্যবান নগদ শস্যের চাষ বাড়িয়ে তোলা, যেমন—সূতী বস্ত্র। যুক্ত(রাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের পরে, সবচেয়ে বেশী উৎপাদিত সূতি বস্ত্র, ইংলন্ডে করার ব্যাপারটা হয়ে গিয়েছিল খুবই অনিশ্চিত। ব্রিটিশ সূতিবস্ত্র শিল্প ধাক্কা খেয়েছিল ভারতীয় সুতীর কাছে। এর ফলে সূতীবস্ত্রের বিশাল চাহিদা বা মূল্য বৃদ্ধি শু(হ'ল। ফলে মারাঠা চাষীরা শু(করলো প্রচুর পরিমাণ সূতির চাষ অকর্ষিত জমিতে। সরকারের কোনও শর্তই ছিল না। গ্রামীণ ঋণের ব্যাপারে। গুজরাঠি, সিন্ধি এবং মাড়োয়ারী বেনিয়ারা পতঙ্গের পালের মতো এই অঞ্চলে এসে জুটেছিল, এবং ৫০ শতাংশ সুদে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ঋণ দান করেছিল। এই আকস্মিক উন্নতি বা মূল্যবৃদ্ধির সময়কাল বেশ কিছুকাল চলছিল এবং কৃষকদের ধার শোধ করতে কোনও অসুবিধা হয়নি, সেইসঙ্গে প্রচুর লাভও হচ্ছিল। ১৮৬৪ সালের বন্দোবস্ত অনুসারে সরকারও বাড়িয়ে তুলেছিল রাজস্বের চাহিদা। কিন্তু ১৮৭০ সালের পর আমেরিকান সূতী ফিরে এসেছিল বি(বাজারে আর তুলনায় নিম্নমানের ভারতীয় সূতী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ঋণী কৃষকরা ব্যর্থ হয়েছিল মহাজনদের কাছে তাদের ধার শোধ করতে। এরা ব্যর্থ হয়েছিল বকেয়া ঋণ শোধ করতে ও খুব তাড়াতাড়ি শুল্কাধীন শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। মহাজনরা যে জাল খতিয়ান রাখতো তাতে দেখা যেতো ধার কখনই শোধ হতো না। সরকার আইন পাস করেছিল এই দুর্নীতি প্রতিরোধের কিন্তু কোনও ফল হয়নি।

যেমন সূতী ব্যাবসার দর পরে গিয়েছিল। ফলে কৃষকরা সমস্ত অসুবিধাকে তুচ্ছ করে সরকার এবং মহাজনদের চাহিদা মেনে নিয়েছিল। কোনরকম সরকারী উপশম যেমন তকভী লোন মঞ্জুর হয়নি, তাদের নিঃসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা ভয়ংকর বিদ্রোহে পৌঁছে ছিল, যার ফল মহাজনদের হত্যা, তাদের হিসেবের কাগজ পোড়ানো, এবং সার্বিকভাবে লুঠ করা হয়েছিল তাদের দোকানপত্র। এই বিদ্রোহ ৩৩টি তালুকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ৩ মাস ধরে চলেছিল, শেষ পর্যন্ত প্রশাসন এই বিদ্রোহের পরিস্থিতিকে সামাল দিয়েছিলেন। সরকার এই কৃষক অভ্যুত্থান থেকে শি(া নিয়েছিলেন, পুরনো ঋণ মকুব আইন করে কৃষকদের যন্ত্রনা উপশম করার চেষ্টা করেছিলেন।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে নীল চার্লসওয়ার্থ দেখেছিলেন মহাজন ও কৃষকদের মধ্যে সামান্য কলহের ছবি। সরকারের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি(কে তিনি চিহ্নি(ত করেছিলেন একটি অতিকথা (Myth) হিসেবে। যাইহোক আয়ান ক্যাটানাথ সমর্থন করেছেন গ্রামীণ ঋণের ব্যাপারে সরকারী ঋণের ঔদাসীন্য। অন্যদিকে ঐতিহাসিক রবীন্দ্রর কুমার বলেছেন, এই ব্যাপারে কোনও প(কেই দোষ না দিয়ে বরং পরিস্থিতিকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু ডঃ চিত্তব্রত পালিত-এর মতে, বিদ্রোহের জন্য সমানভাবে দায়ী ছিল সরকার এবং মহাজনরা। এটা উত্তেজিত করে তুলেছিল জনমতকে দীর্ঘকালের জন্য এবং শেষপর্যন্ত পুনা সার্বজনিক সভার কারণে জনগনের বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

৬.৪ সাঁওতাল বিদ্রোহ

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতক জাগিয়ে তুলেছিল প্রতিরোধ ভারতবর্ষের সকল দিক থেকে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছতে। সাঁওতাল বিদ্রোহ বা আন্দোলন ছিল মহাবিদ্রোহের একটি সহায়ক অবস্থা। ব্রিটিশ প্রাধান্য এবং রাজস্ব ব্যাবস্থা ধীরে ধীরে (য় করে ফেলেছিল ঐতিহ্যগত স্বনির্ভর সম্প্রদায়গুলিকে। উপজাতি এলাকাগুলিও বলপূর্বক ব্রিটিশ প্রাধান্যে আনা হয়েছিল। সাঁওতালরাও এর ব্যতিক্র(ম ছিল না(তারা সরে এসেছিল তাদের নিজস্ব স্থান হাজারীবাগ থেকে(ক্র(মবর্ধমান জনসংখ্যা বাড়ার কারণে এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে কৃষিকার্যের পদ্ধতির কারণে। সাঁওতালরা ভাগলপুরে চলে গিয়েছিল এবং সেখানে তাদের সাঁওতাল রাজ তৈরি করেছিল। যখন মুঘলরা এখানে কর্তৃত্বের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল তাদের ওপর, তখন তারা মুঘলদের করদ হিসেবে বার্ষিক রাজস্ব দিতে রাজি হয়েছিল নিজেদের স্বায়ত্ত শাসন ধরে রাখার জন্য। কিন্তু যখন ব্রিটিশ বক্সারের যুদ্ধের পর জোর দিয়েছিল তাদের

কর্তৃত্বে, তারা দাবী করেছিল বার্ষিক রাজস্ব সাঁওতালদের কাছ থেকে। এটা শেষপর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল সাঁওতাল ও ব্রিটিশদের সরাসরি সংঘর্ষে এবং তাদের স্বাধীনতার জন্য প্রথম লড়াই সমাপ্ত হয় ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বীর (Tilaka Majhi) তিলকা মাঝির শহীদত্বের মধ্যে দিয়ে।

সাঁওতালরা এরপর চলে এসেছিল পূর্ব রাজমহলে কিন্তু মালপাহাড়ীরা তাদের সেখানে থাকতে অনুমতি দেয়নি। তারা এরপর যখন নতুন বাসস্থানের সন্ধান করছিল(সেই সময় ১৮১৯ সালে ভাড়া বাতিল (Quit Rent) অনুসারে রাজমহলের সুপারিনটেনডেন্ট জেমস পনটেট তাদের দামিনিকোতে থাকার অনুমতি দেন। সাঁওতালরা জঙ্গল পরিষ্কার করে এবং প্রায় ২৫০০ একর পতিত জমিকে চাষের যোগ্য ভূমিতে পরিণত করে, আর সেখানে তাদের গ্রামগুলি প্রতিষ্ঠা করে, ধান, শস্য, তামা, সর্ষে এবং অন্যান্য কৃষিজাত শস্য থেকে উৎপাদিত গ্রামীণ উদ্বৃত্তকে মুছে ফেলার জন্য ১৮৫১ সালের মধ্যে রাজস্বকে দশগুণ বাড়িয়ে ৪৩,০০০ হাজারের ওপরে নিয়ে আসা হয়েছিল।

এটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার তাদের প(। তাদের মুক্তি(বোধের যা সম্পূর্ণ বিরোধী। ব্রিটিশ সরকার মারওয়ারী এবং ভোজপুরী মহাজনদের এই জায়গায় আসতে অনুমতি দিয়েছিল। তারা সাঁওতালদের রাজস্ব দিয়েছিল সরকারের কাছে এবং প্রবেশ করেছিল তাদের ৫০ শতাংশ সুদ পরিশোধের ভিত্তি'র চুক্তি(তে। মহাজনরা আগ্রহী ছিল তাদের মূল্যবান নগদ শস্যের প্রতি যা তারা প্রচুর লাভের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ এজেন্সী হাউসগুলির কাছে বিক্রি(করতো। এমন কি তাদের সমস্ত শস্য সমর্পন করার পরও ধার কিন্তু কখনই মহাজনদের হিসাবের খাতা থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। তারা বাধ্যতামূলক শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবেই অঞ্চলটিকে তিনটি স্বতন্ত্র বিচারালয়ের অধীনে রেখেছিল যেমন(সুরী, দুমকা এবং মুর্শিদাবাদ। আর সেইসঙ্গে কিছু থানাও। ভুক্ত(ভোগীরা কোনওমতেই এজলাসে উপস্থিত হতে পারতো না এবং দারোগারা অত্যাচার করছিল মহাজনদের সঙ্গে যুক্ত(হয়ে। সেখানে ছিল অন্যান্য অত্যাচারীরা যেমন((দ্র বাঙালী ব্যবসায়ী এবং সাহা উপাধিধারী দেশী মদের ব্যাবসায়ীরা। কিছু জমিদার এবং নীলকররাও তাদের হয়রান করেছিল। এমনকি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ঠিকাদাররা তাদের চুক্তি(ভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে নিয়েছিল, অত্যাচার করেছিল এবং সাঁওতাল মহিলাদের (ীলতাহানি ঘটিয়েছিল, সাঁওতালরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় সিধু এবং কানহু নামে দুজন নেতা বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল যেন স্বর্গীয় বিভাগ দ্বারা বিভূষিত হয়ে অত্যাচারীদের বি(দ্ধে। তাঁরা সমর্থ হয়েছিল ১০ হাজার সাঁওতালকে একত্রিত করতে বিদ্রোহের প(। বিদ্রোহ শু(হয়েছিল যখন দুমকার দারোগা মহেশলাল দত্ত ভাগলপুর জেলে কার্যোপল(যাচ্ছিলেন তখন এক সাঁওতাল মাঝিকে তার ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন তিনি বারহাইতের কাছের মাঠ পেরোচ্ছিলেন, তখন সাঁওতালরা তাকে আক্র(মণ করে এবং তার শিরোচ্ছেদ করে আর মাঝিকে মুক্ত(করে। এরপর তারা ভয়ানক হয়ে ওঠে এবং মেরে ফেলে অনেক অত্যাচারীদের, যাদের মধ্যে কিছু দারোগাও ছিল। ব্রিটিশরা এরপর তাদের সেনাবাহিনী নিয়ে আসে এবং তিন দিক থেকে আক্র(মণ শানায় এবং সম্পূর্ণভাবে সাঁওতালদের পরাভূত করে। বহু সাঁওতালের মুন্ড মাটিতে গড়ায় আর সিধো কানহু এই সংঘর্ষে মারা যায়। সাঁওতালদের এই বিদ্রোহ ছিল চূড়ান্ত সংগ্রাম ব্রিটিশ আর্থ-রাজনৈতিক অত্যাচারের বি(দ্ধে।

ব্রিটিশ সরকার এই বিদ্রোহের পরে সাঁওতালদের প্রতি নমনীয় নীতি গ্রহণ করেছিল। সৃষ্টি করেছিল স্বতন্ত্র সাঁওতাল জেলা। ১৮৬৪ সাল থেকে আমরা দেখতে পাই তাদের জমির খাজনা অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এই সম্প্রদায়টিকে র(া করার চেষ্টা হয়েছিল। সাঁওতালরা মানিয়ে নিতে পারেনি চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের সঙ্গে কিংবা বলা যেতে পারে বাঙালী রায়তদের প্রথাগত কৃষি ব্যাবস্থার সঙ্গে তারা ক্র(মশ কোন ঠাসা হয়ে পড়েছিল আর তাদের গ্রামগুলি ভেঙে পড়েছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তারা শু(করেছিল ঘেরওয়ার বা শুদ্ধিকরণ আন্দোলন। এর ফলস্বরূপ ১৮৮০-তে দেখা দিয়েছিল মাঝি আন্দোলন। যেখানে তারা প্রতিবাদ জানিয়েছিল জনসংখ্যা গণনা ও জমি জরিপের

কাজকর্মকে। তাদের আন্দোলনের কখনও মৃত্যু হয়নি এবং যা পরবর্তীকালে বর্তমানের ঝাড়খন্ড আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

৬.৫ মুন্ডা আন্দোলন

মুন্ডারা হলো আর একটি আদিম উপজাতি সম্প্রদায়। যারা বিহার প্রদেশেব রাঁচি এবং হাজারিবাগ জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করতো। এদেরও একইরকম প্রাচীন সম্প্রদায়গত পদ্ধতি ছিল। এরাও ছিল ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যাবস্থার কঠোরতার শিকার। অরণ্য আইন তাদের জঙ্গল এবং অরণ্য জীবন থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছিল। এবং আর একটি গু(ত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল মিশনারী সাহেবরা সত্রি(য় ছিল তাদের খ্রীষ্টান ধর্মে দী(ত করার (ে ত্রে এবং একইসঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি নতজানু হতে শেখাতে। উপজাতি পরম্পরা অনুসারে মুন্ডারা তাদের যৌথ জমি চাষ করতো, যার নাম ছিল খুন্তাকাতি (Khuntakatii)। কিন্তু এই পদ্ধতি ধীরে ধীরে (য় প্রাপ্ত হতে লাগলো নতুন জায়গীরদার, ঠিকাদার এবং মহাজনদের অনধিকার প্রবেশের ফলে। মহাজনরা ধীরে ধীরে তাদের চিরস্থায়ী ঋণের জালে মুন্ডাদের জড়িয়ে ফেললো এবং তারা দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলো। মুন্ডায় তাদের মকদ্দমা বিচারালয় বা এজলাসে নিয়ে গেল কিন্তু কোনওরকম সুবিচার পেল না। মিশনারী সাহেবরা মুখে সমবেদনা জানালেও এতে কোনও কাজ হলো না। ১৮৯৯ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে সমগ্র রাঁচীতে বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা বিদ্রোহ বা উলগুলান সংগঠিত হলো।

১৮৭৪ সালে বীরসা মুন্ডার জন্ম হয়। তিনি ছিলেন একজন ভাগচাষীর সন্তান। কিন্তু তিনি কিছু শি(া পেয়েছিলেন, খ্রীষ্টান মিশনারীদের কাছ থেকে। তাঁরও ছিল সিধো-কানহো'র মতো এক গভীর দৃষ্টি। এবং তিনি মুন্ডাদের মুক্তি(আন্দোলনে অলৌকিক (মতা সম্পন্ন মুক্তি(দাতায় পরিণত হয়েছিলেন। মুন্ডারা তাঁকে ঘিরে সমবেত হয়েছিল এবং ঈ(ের বলে চিহ্নি(ত করেছিল। বীরসা খুব তাড়াতাড়ি জড়িয়ে পড়েছিলেন কৃষি এবং রাজনৈতিক অসুবিধাগুলির সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক ধর্মীয় আন্দোলন ত্র(মে পরিণত হয়েছিল অত্যাচারীতদের প্রতি মুন্ডাদের গেরিলা যুদ্ধ। এরা ছিল ভূস্বামী, মহাজন, জেলা বিচারক, এবং খ্রীষ্টানগন। তারা বন্ধ করে দিয়েছিল খাজনা দেওয়া এবং তাদের সীমানা থেকে ব্রিটিশ অপসারণ চাইছিল। ১৮৯৯ সালর ২৪ ডিসেম্বর মুন্ডারা আত্র(মণ করেছিল রাঁচি এবং সিংভূম জেলার চার্চ, সরকারী কার্যালয় এবং পুলিশ চৌকি। এছাড়াও মুন্ডা সেনারা ভূস্বামী এবং মহাজনদের আত্র(মণ করেছিল। যাইহোক তারা শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দ্বারা পরাজিত হয়েছিল। বীরসা মুন্ডা ধরা পড়েন এবং পরে জেলে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর মুন্ডা বিদ্রোহ শেষ হয়ে যায়।

যাইহোক এই আন্দোলনের প্রভাব সরকারের ওপর পড়েছিল। ১৯০২ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জরিপ ও বন্দোববস্তের কাজে এবং ১৯০৮ সালে ছোটনাগপুর 'Tenancy' আইনে। মন্ডাদের 'Katti' অধিকারের মধ্যে দিয়ে যা চিহ্নি(ত হয়েছিল। জবরদস্তি মূলক শ্রম ব্যাবস্থা বা 'বেথ-বেগারি' মুছে দেওয়া হয়েছিল। এই মুন্ডা বিদ্রোহের স্মৃতিতেই পরবর্তী সময় ছোটনাগপুরের ওঁরাওদের মধ্যে 'থানা ভাগথ' আন্দোলন প্রেরনা পেয়েছিল। মুন্ডাদের মধ্যে বীরসামুন্ডা ঈ(েররূপে পূজিত হতে লাগলেন। তিনি মুন্ডা তথা সমগ্র মানুষের স্মৃতিতে লোকসংগীত আর লোকগল্পের মধ্যে দিয়ে বেঁচে রইলেন। মুন্ডা বিদ্রোহকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেমন, জাতীয়তাবাদী, নিম্নবর্গীয়, অথবা বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝাড়খন্ড আন্দোলন— ব্যাখ্যা যাইহোক না কেন এর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকাকে কখনই অস্বীকার করা যাবে না।

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. এ. আর. দেশাই—পেজেন্ট স্ট্রাগলস্ ইন ইন্ডিয়া

২. ডি. এন. ধানাগারে—পেজেন্টস্ মুভমেন্ট ইনি ইন্ডিয়া

৩. সুপ্রকাশ রায়—ভারতের গণতান্ত্রিক কৃষক সংগ্রাম (বাংলা বই)

৪. ব্লেয়ার কিং—দি ব্লু মিউটিনি

৫. চিত্তব্রত পালিত— টেনশনস্ ইন বেঙ্গল (র‍্যাল সোসাইটি

৬. কে. কে. সেনগুপ্ত— দি পাবনা আপরাইজিং অ্যান্ড পলিটিকস্ অফ রেন্ট

৭. চিত্তব্রত পালিত— পারসপেকটিভস্ অন্ অ্যাগ্রারিয়ান বেঙ্গল

৮. এন. চার্লসওয়ার্থ—পেজেন্টস্ অ্যান্ড ইমপিরিয়াল (ল

৯. আর. কুমার—ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ইন দ্যা নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী

১০. সি. পালিত—রিভোল্ট ষ্টাডিজ, দ্বিতীয় খণ্ড

১১. কে. কে. দত্ত— দি সানতাল ইনসারেকশন

১২. আর. গুহ—এলিমেন্টারী অ্যাসপেক্টস অব পেজেন্ট ইনসারজেন্সী ইন কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া

১৩. এস. মল্লিক—ট্রানসফরমেশন অব সানতা ল সোসাইটি

১৪. ডি. এন. বাক্সে—সাঁওতাল গনসংগ্রামের ইতিহাস (বাংলা বই)

১৫. কে. এস. সিং—ডাস্ট ষ্টর্ম এ্যান্ড দি হ্যাংগিং মিস্ট

১৬. কে. এস. সিং—দি বীরসা মুভমেন্ট

৬.৭ অনুশীলনী

১. নীল বিদ্রোহ কেন হয়েছিল? এবং এই বিদ্রোহে কৃষক ও জমিদারদের ভূমিকা কি ছিল?

২. কি Politics of rent. শেষ হয়েছিল পাবনা বিদ্রোহে? এবং এই প্রসঙ্গে Agrarian League (কৃষক সংঘের) ভূমিকা কি ছিল?

৩. ব্রিটিশরা কতটা দায়ী ছিল ডেকান বিদ্রোহে? এটা কি শুধুই মহাজনদের বি(দ্ধে একটি সংঘাত?

৪. সাঁওতাল বিদ্রোহ কি ভাবে ওপেনিবেশিকবাদী বিরোধী আন্দোলন হয়ে উঠেছিল?

৫. মুন্ডা বিদ্রোহে বিরসার ভূমিকা আলোচনা কর?

একক ৭ ❑ সম্পদ নিষ্কাশন নীতি

গঠন

৭.০ সম্পদ নিষ্কাশন
৭.১ অবশিল্পায়ন এবং বিতর্ক
৭.২ গ্রন্থপঞ্জি
৭.৩ অনুশীলনী

৭.০ সম্পদ নিষ্কাশন

সম্পদ নিষ্কাশন তত্ত্বকে দুটি ধাপে পড়া যায়—

(ক) Company-র শাসনে ভারতবর্ষ
(খ) British সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতবর্ষ।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে company'র সঙ্গে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ্-দৌল্লার চরম পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে কোম্পানীর শাসন শু(হয়েছিল। মীরজাফর সিরাজ-উদ্-দৌল্লার পরবর্তী নবাব হিসেবে কোম্পানীকে ১৭ কোটি টাকার বিনিময়ে নবাবপদে আসীন হয়েছিলেন। কোম্পানী ত্র(মেই হয়ে উঠলো সর্বেসর্বা এবং মীরকাশিম থেকে মীরজাফর বারবার একই পদ্ধতিতে তারা সম্পদ নিষ্কাশিত করেছিল। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর বিশাল অঙ্কের লাভ উঠে এসেছিল রাজস্ব সংগ্রহের ভিতর দিয়ে। কোম্পানী ভোগ করছিল কর্তব্যযুক্ত(অন্তঃর্দেশীয় বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা আর এমনকি কোম্পানীর কর্মচারীরাও দস্তকের অপব্যাবহার করছিল তাদের নিজস্ব বাণিজ্যের (ে ত্রে। ক্লাইভ এবং হেস্টিংস-এর মতো গভর্নরগণ অগাধ সম্পত্তি হস্তগত করেন এবং একই পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি(রা তখন থেকেই প্রচুর অর্থ নিয়ে ইংলন্ডে ফিরে যান। সরকারের বাহ্য ব্যবসার (ে ত্রে কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যাবসা ধরে রেখেছিল এবং আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রচুর লাভ করেছিল। সনদ আইন কোম্পানীর ব্যাবসা শাখাকে ছেঁটে দিয়েছিল। ততদিনে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ সম্পদ নিষ্কাশিত হয়েছিল, মূল্যের হিসেবে যা ৬ মিলিয়ন পাউন্ড।

ইংলন্ডে সরাসরি সম্পদ নিষ্কাশণ ছাড়াও গোপন পথেও তা নিষ্কাশিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রসারণের মূল অর্থকরী শক্তি(, বাংলার রাজস্ব আয়ের ওপর নির্ভর করতো। এমনকি অর্থ যোগান দেওয়া হতো, মাদ্রাজ এবং বোম্বের কোষাগারে আর বহুদূরের দ(ণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশে।

যখন ভারতবর্ষ কোম্পানী সরকারের হাত থেকে সরাসরি ব্রিটশি রাজতন্ত্রের আওতায় এলো তখন স্বাভাবিক ভাবেই ভারতবর্ষ বিদেশী প্রশাসনের অধীনে এসেছিল, সেত্রে(টারী অব স্টেট এবং তার সেত্রে(টারিয়েটের মারফত। এর অর্থ হ'ল বিরাট সম্পদের নিষ্কাশন। সরকার জবরদস্তি মূলক হোম চার্জ আদায় করেছিল এবং বিশাল পরিমাণ বার্ষিক রাজস্ব প্রায় ১৭ মিলিয়ন পাউন্ড স্টারলিং ধার্য করেছিল প্রশাসন চালানোর জন্য যা আর. সি. দত্তের ১৯০২-১৯০৩ সালের লেখায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া অন্যান্য যেসব দূরবর্তীস বিষয়গুলি ছিল যেমন, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ ভারতীয় কর্মচারীদের পেনসন আর বকশিস্ লাভ ইত্যাদি (ে ত্রে, তাছাড়া ভারতবর্ষের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তারের (ে ত্রে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী র(নাবে(নের জন্যে। ৫% নিশ্চিত সুদ ভারতীয় রেলের দেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীদের লাভ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া ইত্যাদি।

এই সমস্ত খাতে সম্পদের নিষ্কাশন ভারতর্ষকে ত্র(মশ দুর্বল করে দিয়েছিল এবং সম্পদশালী ভারতের সম্বন্ধে কথিত অতিকথা (Myth) প্রত্য(ব্রিটিশ শাসনের ফলে খন্ড খন্ড হয়ে পড়েছিল, ভারতীয় জনসমাজের ত্র(মবর্ধমান দারিদ্রের উন্মেষে যা আমরা উইলিয়াম ডিগ্‌বির 'সমৃদ্ধশালী ব্রিটিশ ভারত' নামক গ্রন্থে দেখতে পাই। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদী পণ্ডিত দাদাভাই নৌরজী একই সঙ্গে তাঁর লেখা বা বক্তৃ(তায় British Parliament-এ ভিতরে বা বাইরে তাঁর প্রিয় সম্পদ নিষ্কাশন তত্ত্ব এবং ভারতবর্ষের দারিদ্র নিয়ে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যাইহোক তাঁর গ্রন্থের নামটা ছিল অত্যন্ত মধ্যপন্থী অর্থাৎ "Poverty and Unbritish rule in India" এই কাজটির বিষয়বস্তু ছিল প্রগতিশীল। ভারতীয়দের মাথাপিছু গড় আয় এবং তাদের দেয় রাজস্ব এবং ভারতীয় অর্থ যা ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে চলে গিয়েছিল তার পরিসংখ্যান। তিনি এটা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝিয়েছিলেন এবং একই সময়ে আর. সি. দত্ত ১৯০২ থেকে ১৯০৩-এ ভারতবর্ষের জনগণের দারিদ্র ছিল বস্তুত, সম্পদ নিষ্কাশনের প্রত্য(ফল। ভারতের প্রগতিশীল ব্রিটিশ ভাবমূর্তি, পুরোপুরি ভেঙে দিয়েছিল এবং ব্রিটিশ কর্তৃপ(তাঁর সওয়ালের কোনও উত্তর দেন নি। কিছু কিছু ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ যেমন, থিওডোর মরিসন এবং ভেরা অ্যানস্টে চেষ্টা করেছিলেন সওয়াল করার, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিনিয়োগ অতিরিক্ত(হয়ে গিয়েছিল তার অর্থনৈতিক উন্নতির তুলনায়। ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষকে দিয়েছিল অত্যন্ত উন্নত প্রশাসন, সেনাবাহিনী, শি(া, জনস্বাস্থ্য, রেলওয়ে, ডাক ও তার ব্যবস্থা, যা ভারতবর্ষকে আধুনিক যুগে উন্নীত করেছিল। ব্রিটিশ লগ্নীকারীরা ভারতবর্ষে প্রচুর শিল্প গড়ে তুলেছিল। অর্থ যোগান দিয়েছিল এবং সেইসঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ব্যাবস্থাকে উন্নত করার জন্য ঝুঁকি নিয়ে তার পরিচালনা করেছিল। ভারতীয় সাংবাদিক এম. ডি. রাণাডে এবং জি. সি. যোশী এই বিশেষজ্ঞদের বলা কথাগুলির মধ্যে তার কারণ খুজে পেয়েছিল। তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন ইংলন্ডের কাছে ভারতের ঋণ, কিন্তু আর.সি. দত্ত ভারতের কাছে ইংলন্ডের যে ঋণ তা দেখান নি। পুনঃপুনঃ ঘটিত দুর্ভি(এবং গন-দারিদ্রের প্রসঙ্গে তাংদের অবস্থান হয়ে উঠেছিল ত্র(মশই অপ্রাসঙ্গিক একজন রাজতন্ত্র এবং মধ্যপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তি(ত্ব হিসেবে। দাদাভাই দেখিয়েছিলেন তাঁর সম্পদ নিস্কাশন তত্ত্বে, যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন ভারতীয় দারিদ্র অত্যন্ত গভীরভাবে অন্যান্য দৃষ্টিকোণগুলি থেকে। এটি ছিল ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসন যা শেষ পর্যন্ত ছিল সম্পদ নিষ্কাশন এবং দারিদ্র্যের কারণ। ব্রিটিশ শাসনের দু-দিক থেকে এদেশ ছেড়ে যাওয়ার একটি ছিল কারণ।

৭.১ অব-শিল্পায়ন এবং অব-শিল্পায়ন বিতর্ক

ইওরোপীয়দের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতবর্ষের ধনসম্পদ নিয়ে বাণিজ্যিক বিশ্বে এক বিরাট কিংবদন্তী চালু ছিল এবং দুঃসাহসিক অভিযানকারীদের উত্তেজিত করতো 'সব পেয়েছির দেশ' ভারতবর্ষের ধনসম্পদ আহরনের কল্পনাতে। ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী স্থাপন এবং 'Nabobs' দের অবি(শ্বাস্য ধন সম্পদ সঙ্গে নিয়ে ইংলন্ডে ফিরে যাওয়া, বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলির প্রতিযোগিতা এবং মুক্ত(ব্যবসায়ীদের কল্পনার প্রজ্জ্বলন ঘটেছিল। অতিরঞ্জন সত্ত্বেও ঘটনা হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষ ছিল সার্বিকভাবে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী দেশ যদিও সেই সম্পদ ছিল কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রিভূত। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ পরিদর্শন করেছিলেন এবং এই শহর সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক গান গেয়েছিলেন যে 'এই শহর ব্যাপক জনসমৃদ্ধ আর ধনী অনেকটা যেন লন্ডনের প্রায়, সঙ্গে এই তফাৎ যে সেখানে ছিল ব্যক্তি(গত অসীমত্বের প্রথম অধিকার, পূর্বের শহরের থেকে আরও প্রবল সম্পদ। মানুচ্চি তাঁর স্মরনিকায় লিখেছিলেন, মুঘলদের সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে বাংলা ছিল ফ্রান্স-এ সর্বাধিক পরিচিতি। সেখান থেকে বিশাল ধনীদের ইউরোপে আসাই প্রমাণ করে এর বিশাল সমৃদ্ধির কথা। আমরা একটু ঝুঁকি নিয়ে বলতে পারি যে, এটা কোনও অর্থেই ইজিপ্ট-এর তুলনায় নিম্নতর নয়, এমনকি এটা ছাপিয়ে গিয়েছিল, সিল্ক, সুতী, চিনি, ও নীল উৎপাদনে যেই দেশকেও সমস্ত জিনিস এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো। যেমন ফল, মটর, শিম ইত্যাদি। শস্যদানা, মসলিন, বস্ত্রাদি সোনা এবং সিল্ক। ভারতবর্ষের

বহিঃর্দেশিয় বাণিজ্যের বিস্তার ধরতে পারা যায়, নিচের কয়েকটি পংক্তি(থেকে। সপ্তদশ শতকের শেষে বিশাল পরিমাণ সস্তা ছিট-কাপড় মসলিন এবং উজ্জ্বল ভারতীয় ছাপানো সূতির কাপড় ইংলন্ডে আমদানী করা হতো। তারা দেখেছিল সিল্ক এবং উল-এর নির্মাণকারীরা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠেছিল। তদনুসারে বলা যেতে পারে পার্লামেন্ট-এর আইন পাস হয়েছিল ১৭০০ এবং ১৭২১-এর মধ্যে যা পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল কতগুলি বিশেষ স্বতন্ত্র বিষয়ে। বলা হয় পোষাক পরিচ্ছদ অথবা আসবাবপত্রের (ে ত্রে ইংলন্ড-এ রং করা সুতির কাপড় বা ছাপনো কাপড়ের নিযুক্তি(এবং রঙ করা জিনিস বা ছাপানো জিনিসের যে কোনও ব্যবহার যার মধ্যে সুতি তৈরী ছিল সবচেয়ে বেশী।

I.C.A. Knowles দেখিয়েছিলেন, ভারতের সঙ্গে ইংলন্ড-এর বাণিজ্য সমস্যা। প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের কঠিন সমস্যা শায়িত ছিল। বস্তুত এই যে, ইওরোপ খুব কম সংখ্যক জিনিসই পাঠিয়েছিল যা প্রাচ্য চেয়েছিল। সামান্য বিলাসিতার উপকরণ রাজ্যসভার জন্য—তামা, দস্তা, টিন, পলা, সোনা ও গজদন্ত, রূপো বাদ দিয়ে এগুলি একমাত্র পণ্যদ্রব্য ছিল যা বি(ে গ্রাস করেছিল। অতঃপর এটি ছিল প্রধানত রূপো যা নিস্কাশিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের আগে ভারতবর্ষে দেশীয় শিল্পগুলির গুণগত মান এবং শৈল্পিক দ(তা ১৯১৬ থেকে ১৯১৮-র "Indian Industrial Commission" রিপোর্টে এর সা(্য পাওয়া যায়। এর ভূমিকায় আমরা পড়ি—একটা সময় যখন ইওরোপের পশ্চিম, আধুনিক শিল্প ব্যবস্থার জন্মভূমি অধিকৃত হয়েছিল অসভ্য উপজাতিদের দ্বারা, ভারত তখন বিখ্যাত ছিল তার শাসকদের সম্পদের জন্য এবং কারিগরদের উচ্চ-শৈল্পিক দ(তার জন্য। এমনকি অনেক পরবর্তীকালে যখন পশ্চিম থেকে দুঃসাহসিক ব্যবসায়ীরা প্রথম ভারতবর্ষে এসেছিল, তখন এদেশের শিল্পের উন্নতি কোনওভাবেই ন্যূনতম ছিল না। অনেক বেশী অগ্রগতি সম্পন্ন ইওরোপীয় দেশগুলির তুলনায়।

আর. এম. মার্টিনের সা(্য ১৮৪০ সালের 'Parliamentary Enquiry Committee'-র ছিল যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য—আমি মানতে পারি না যে, ভারতবর্ষ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। ভারতবর্ষ যতখানি শিল্পভিত্তিক দেশ ঠিক ততখানি কৃষিভিত্তিক এবং যে যে কিনা সন্ধান করছে, যে তাকে কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে পরিণত করতে চায় তাকে সভ্য দেশগুলির থেকে নিম্নে নামিয়ে আনার ল(্য ছিল তাদের, আমি স্বীকার করি না যে ভারতবর্ষ হয়ে উঠবে ইংলন্ড-এর কৃষিকর্মের (ে ত্র। যে একটি শিল্প নির্মাণকারী দেশ। তাঁর শিল্প নির্মাণকারীরা নানারকমভাবে অস্তিত্বময় ছিল বহুদিন ধরে এবং কখনই সমর্থ ছিল না কোনও রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যেখানে পরিস্কার কার্য তাদের ওপর অর্পিত হয়েছিল। আমি এখন তার কা(্মেরী-শাল কিংবা ঢাকা মসলিনের কথা বলছি না। বরং আরও নানা জিনিসপত্র সে নির্মাণ করেছিল, যা কিনা পৃথিবীর যে কোন অংশের থেকে গুনগত মানে উচ্চ। এখন তাকে নিম্নতর অবস্থায় এনে শুধুমাত্র কৃষিভিত্তিক দেশ বললে, ভারতের প(তা অবিচার করা হবে।

উনিশ শতকের সন্ধি(ণে ভারতবর্ষ, সমস্ত আবশ্যকতাসহ পরিণত হয় নির্মাণকারী বাণিজ্যিক রাষ্ট্র হিসেবে। ভারতবর্ষ গর্ব করতে পারতো তার সমৃদ্ধশালী সম্পদের জন্য, যা তাকে স্থাপন করেছিল ভুলের ঊর্ধ্বে 'Indian Industrial commission-এর প্রতিবেদনে। এর ছিল সম্পদ ও দ(তা, এর ছিল ব্যাঙ্ক ও জাহাজ ব্যবসা, ছোট ও বড় ব্যবসায়ী যারা সমাবেশ ঘটিয়েছিল উৎপাদনের জন্য সম্পদের(এর ফলে ভারতবর্ষ আত্মনির্ভরশীল দেশে পরিণত হয়েছিল। ব্যাঙ্কারদের তালিকায় প্রথম স্থানেই ছিল জগৎ শেঠের গদি। সরকারী খাজনার বা রাজাদের সংর(ক হিসেবে, বাণিজ্যিক ঋণের ব্যাবসায়ী, বুলিয়নের আড়তদার এবং প্রচলিত মুদ্রার নিয়ন্ত্রক হিসেবে। এটি কার্যত শ্রান্ত ও লালিত হয়েছিল বাংলার বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে। এর গু(ত্ব ও যোগ্যতা স্থাপন করেছিল দেশীয় ব্যাঙ্কিং বৈশিষ্ট্যের সমহারে যে কোনও ইউরোপীয় প্রতিরূপ। অধিকন্তু ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেশ কিছু 'সরফস্' যাঁরা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে ছিল। সুর(ার বদলে সমমূল্যে অর্থলগ্নী যারা করতো, অন্তঃর্দেশিয় বাণিজ্যের বৃহত্তর সচলতাকে নিশ্চিত করার জন্য। বাংলা এবং বোম্বের বাঙালি ও পার্সি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু খ্যাতনামা জাহাজ ব্যবসায়ী ছিলেন যাঁদের নিজস্ব (ি প্রগতি সম্পন্ন

বাণিজ্য জাহাজ ছিল। ভারতীয় জাহাজ সমূহ ব্রিটিশ কর্তৃপ(র কাছে শঙ্কার কারণ ছিল। যা জানা যায়, বিদেশ থেকে, আসা জিনিসপত্র যা ভারতীয় নাবিক, লস্কর ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত ছিল, সেই সকল জিনিসপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা থেকে। (54 George III, C 136, 1814)

এইভাবে দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য সন্তোষজনকভাবে উন্নতি করছিল এবং তার সব রকমের প্রত্যাশার সুদূর প্রসারী সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই উন্নতি হঠাৎ কার্যত অচল হয়ে পড়লো, এবং এক শতকের স্থির হয়ে থাকা গতি ভারতবর্ষের ঘড়ির কাঁটাকে উল্টোমুখে অনুসরণ করেছিল।

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক আর. সি. দত্ত সমস্যার সতর্ক অনুসন্ধানের পর দ্বিধাহীনভাবে এই উপসংহারে এসেছিলেন যে, দেশীয় শিল্প এবং ব্যাবসার ধ্বংস ছিল বাংলা থেকে সম্পদ নিষ্কাশনের সরাসরি ফল এবং পার্থক্যসূচক বা প্রভেদমূলক ব্রিটিশ রাজের অর্থনৈতিক নীতি দেশীয় উদ্যোগগুলির বি(দ্ধে। ব্রিটিশ সরকার কৃত নানাভাবে আমাদের শিল্প ও বানিজ্যকে আত্র(মণ অভিজাত মহৎ ব্রিটিশদের কাছে অনাবৃত হয়ে পড়েছিল, তাঁরা অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই ভয়ানক লালসা প্রত্য(করে। আমরা এই ধরনের রক্ত(মো(নকারী ঘটনার উল্লেখ পাই ১৮৩৮ সালে আর. এম মার্টিনের লেখায়—বার্ষিক সম্পদ নিষ্কাশন ব্রিটিশ ভারতের ওপর £ ৩,০০০০০০ পাউন্ড যার মোট পরিমাণ ৩০ বছরে ১২ পারসেন্ট চত্র(বৃদ্ধি হারে সুদ, এক বিশাল পরিমাণ অঙ্কের £ ৭২৩,৯৯৭,৯১৭ কোটি টাকা বা স্টারলিং। নিত্য চলতে থাকে এই নিষ্কাশন এমনকি যা ইংলন্ডকেও খুব তাড়াতাড়ি দরিদ্রে পরিণত করতে পারতো। তার মানে কি সাংঘাতিক-এর প্রভাব ছিল ভারতবর্ষের ওপর। যেখানে শ্রমিকের মজুরী ছিল দিনে দুই পেন্স থেকে তিন পেন্স। অর্ধ শতকের জন্য আমরা চলেছিলেম সম্পদ নিস্কাশনের মধ্যে দিয়ে। কখনও কখনও দুই থেকে তিন কিংবা কোনও সময় চার মিলিয়ন পাউণ্ড স্টারলিং বছরে আসতো ভারতবর্ষ থেকে, যা পাঠানো হয়েছিল ইংলন্ডে বা গ্রেট ব্রিটেনে। আমার মনে হয় এটা কখনই সম্ভব নয়, মানুষের কৌশলে নিবারণ করা যাবে, সম্পূর্ণ অশুভ প্রভাব(ত্র(মান্বয়ে বাড়তে থাকা বছরে তিন থেকে চার মিলিয়ন পাউন্ড সম্পদ বহুদূরের দেশ ভারতবর্ষ থেকে নিস্কাশন যা কিনা কখনই ফিরে আসেনি কোন আকারে।

এফ. জি. শোর, ১৮৩৩ সালে মন্তব্য করেছিলেন, এটা কি সম্ভব যে কোনও দেশ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এই ধরনের একটি সম্পদ নিস্কাশনের মধ্যে যার থেকে সে নিজের দেশকে র(া করতে পারে দারিদ্রের হাত থেকে।

রাজস্ব নির্য্যাসের জায়গা থেকে লর্ড স্যালিসবারি ভারতের ''রাষ্ট্র সচিব বলেছেন, অত্যন্ত তিক্ত(ভাবে ব্যাঙ্গোক্তি(করেছেন যে, যেহেতু আগে থেকে ভারত রক্ত(াক্ত(হয়েই আছে, যেখানে রক্ত(জমাট বেঁধে বা অধিক হয়ে আছে যেখানেই চিকিৎসকের ছুরি চালানো দরকার। যারা আগে থেকেই রক্ত(হীন হয়ে আছে তাদের ে(ত্র নয়।'' এটা ছিল গ্রামের মানুষদের বাঁচানোর প(এক আবেদন। যেখানে মূলধন প্রায় নেই বললেই চলে।

কিন্তু সম্পদের নিস্কাশন অনেক বেশী পরিচিত যা উদ্ধৃত হয়েছে তার থেকে, দেখা যাক্, অসমান আইন এবং প্রভেদ ঘটাতে পারে এমন জিনিস যা আমাদের উদ্যোগগুলিকে গলা টিপে হত্যা করেছিল। আমরা আবার মার্টিনের কথায় ফিরে আসি যাঁর প(পাতিত্বহীন সমালোচনা দেখিয়েছিল সেই লুণ্ঠনকারী পদ্ধতিটিকে। আমি ইতস্তত হয়ে কিছু বলছি না যে, ভারতবর্ষের প্রতি ইংলন্ড প্রদর্শন করেছিল কৃপণ, স্বার্থপর, অনুদার এক ধরণের ব্যবহার যার মধ্য দিয়ে সে তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক পরিচালিত করেছিল ওই দেশের সঙ্গে, তার অবিরাম ত্র(ন্দন, রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য সুযোগ সুবিধা, তার বাস্পীয় কারখানায় তৈরী জিনিসপত্র কলকাতার জন্য ছিল শতকরা এক বা দুই ভাগ। যেখানে বিজয়ির স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি(, যে অরোপ করেছিল হিন্দুদের শ্রমসিদ্ধ বা কারখানায় তৈরী জিনিসপত্রের ওপর শতকরা দশভাগ রাজস্ব এবং একই সময় আরোপিত হয়েছে ভয়ানক ক্লেশকর অথবা নিষিদ্ধজনক বিষয়, তার চিনি কফি ইত্যাদির ে(ত্রে। দেখা

যাচ্ছে ইংলন্ড সতর্ক হয়ে স্মরণ করছে সেই অসম্মানকর নীতি যা তার উপনিবেশ 'United States of America'-কে হারিয়েছিল।

ভারতীয় শিল্প উৎপাদন সম্পর্কে থর্নটন ও একই অভিমত ব্যত্ত(করেছেন—যাইহোক সে অবশ্যই খুব সোজা পথে সাফল্যের (ে ত্রে অগ্রসর হয়েছিল। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আমরা যদি বলি, আমরা তার শিল্প উৎপাদনগুলির সম্বন্ধে কোনও ভাবেই ভগ্নোৎসাহ হবো না। যদিও আমাদের স্মারক গ্রন্থ সেই শর্তসমূহ ধারণ করেছিল, যা বাদ দিয়েছিল তার ভোগ্য সামগ্রী থেকে চিনিকে এবং প্রসারণ ঘটিয়েছিল তার সূতি ও সিল্ক বস্ত্রসমূহের। পূর্বের জিনিসগুলি এই দেশে ব্যয় করা হয়েছিল ১০% ভাগ রাজস্বের সঙ্গে। শেষোত্ত(বিষয়টা ছিল আরও পীড়াদায়ক ২০% রাজস্ব, যেখানে ব্রিটিশ আমদানীকৃত জিনিসপত্র ভারতে ঢুকতো কোনও রকম শুল্ক ছাড়াই। যদি কোনও রকম প্ররোচনা সেখানে দেখানো হতো, এটা অবশ্যই দুর্বলতার কাজ হতো। এখানে ঘটনাটা সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প(।

আসা যাক খোলাখুলি পরিসংখ্যানে। আবারও মার্টিন-এর প্রসঙ্গ ধরে বলতে পারি— ইংলন্ড ব্রিটিশ ভারতের মানুষকে বাধ্য করেছিল ২$\frac{১}{২}$% হারে তাদের বাস্পীয় কারখানায় তৈরী জিনিসপত্র গ্রহণ করতে। যেখানে সে চাপিয়ে দিয়েছিল ২০% থেকে ৩০% হাতে তৈরী শ্রমসিদ্ধ সূতী ও সিল্ক হিন্দুদের ওপর, তার চিনিতে শতকরা ১৫% ভাগ শুল্ক বসানো হয়েছিল, কফিতে ২০০% ভাগ, গোলমরিচে ৩০০% এবং মদে ৫০০% যখন এগুলি আমদানী করা হতো যুত্ত(রাষ্ট্রে।

আমরা এই বিষয়টা Wilson-এর ভাবনাতেও লালিত হতে দেখি— এর সা(্য পাওয়া গিয়েছিল ১৮৩১-এ যখন ভারতবর্ষের সূতী ও সিল্ক-এর জিনিসপত্র ৫০% থেকে ৬০% দামে ব্রিটিশ বাজারে লারে জন্য বিত্রি(করা হয়েছে একটা সময় পর্যন্ত। ওই সকল জিনিসগুলি থেকে নিম্নতম যা ইংলন্ডে বুনে তোলা হয়েছিল। ফলস্বরূপ এটা প্রয়োজনীয় হয়ে ৭০% থেকে ৮০% রাজস্বকে র(া করা তাদের মূল্য অনুসারে বা স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার দ্বারা।

ম্যানচেস্টার এবং 'Paisley' বন্ধ করে দিয়েছিল তাদের উৎপাদনের প্রথম ধাপ এবং অতিকষ্টে চালু করেছিল তার গতি এমনকি বাস্পীয় শত্তি(র সাহায্যে তারা ভারতীয় জিনিসপত্রের ত্যাগের মধ্যে দিয়ে তৈরী হয়েছিল।

রপ্তানী বাণিজ্যের কথা থাক, এমনকি অর্ন্তঃদেশিয় ব্যবসা পরিচালিত হয়েছিল ব্যবসায়িক শ্রেণীর দ্বারা, যা কিনা সন্ধান করেছিল কিভাবে জোর করে মাল চালানোর রাজস্ব, হয়রানী, অগ্রাধিকার সম্বন্ধীয় ব্যবহার ব্রিটিশদের সঙ্গে বন্ধ করা হয়েছিল। আইনসভা এবং অন্যান্য জায়গায়। ট্রেভেলিয়নের প্রতিবেদনে এই সা(্যের ওপর অন্তঃর্দেশীয় শিল্প দাঁড়িয়েছিল। লর্ড এলেনবরা, ১৮৩৫ সালে পার্লামেন্টে যে প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন তা লিখিত হয়েছিল এর থেকে কাঁচা পশুচর্ম দিয়েছিল ৫% যখন এটি চামড়ায় পরিণত হতো তখন দেওয়া হতো ৫% -এর ও বেশী(যখন চামড়া পরিণত হতো বুট এবং জুতোয় তার ওপর আরও ৫% শুল্ক ধার্য করা হতো। এইভাবে যেখানে ১৫% শুল্ক ছিল, ভাতীয় চামড়ার জিনিসপত্র যা ভারতে ব্যবহৃত হতো।

অন্তঃদের্শিয় রাজস্বকে কেন্দ্র করে কম করে ২৩৫টি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। যে শুল্ক ধার্য করা হয়েছে তার বেশীরভাগটাই ছিল ব্যত্তি(গত বা পারিবারিক ব্যবহার। এবং তার কাজের জন্য, এর সঙ্গে সংযুত্ত(হয়েছিল সেই পদ্ধতি যা ছিল অত্যন্ত বিরত্তি(কর এবং অপ্রীতিকর চরিত্রের দিক থেকে এবং রাজস্বের বস্তুগত কোনও লাভ ব্যাতিতই।

শোর নথিভুত্ত(করেছিলেন তাঁর খসড়ায়—অন্যান্য কারণগুলিও অবশ্যই সেখানে উল্লিখিত ছিল, প্রায় সমস্ত বাণিজ্যিক আত্মবিধ্বাস এবং সম্পুর্ণ ঋণের ধ্বংস সাধন আমাদের পৌর আদালতের উৎসাহে হয়েছিল... অসততা হলো... কোনও ভাবেই নয় 'আদৌ স্পষ্ট' এইভাবে ভারতীয়রা কার্যত বাধ্য হয়েছিল একইসঙ্গে অন্তঃর্দেশীয় এবং

বৈদেশিক বাণিজ্যের (ে ত্রে অবসর নিতে। একইরকম বিমাতৃসুলভ আচরণ দেখা দিয়েছিল ভারতীয় মাল জাহাজে করে আমদানী রপ্তানীর (ে ত্রে, যাকে কদাচিৎ বলা হতো জাহাজের মাল বোঝাইকরণ এবং এটা আগেই ১৮১৪-র নেভিগেশন আইনের দ্বারা চিহ্নি(ত হয়েছিল। ভারতীয় জাহাজসমূহ অস্বীকার করেছিল ইংলন্ড-এর জাহাজের মাল বোঝাই করনের অধিকারকে।

আর. সি. দত্ত তাঁর লেখায় চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ একমুখী মুক্ত(বাণিজ্য নীতি, কিন্তু তিনি প্রমাণ করেন নি, সেখানে ছিল একইসঙ্গে একটি সংগ্রামশীল উদ্যোগী শ্রেণী। যাঁরা বৃথাই তাদের মাথা তুলবার চেষ্টা করেছিল। তাছাড়াও তিনি এটা নথিভুক্ত(করেন নি যে ভারতীয়রা ছিল অনেক বেশী একগুঁয়ে এই পরিস্থিতির আধারে, এবং তারা সম্পূর্ণরূপে উচ্চকিত ছিলেন তাদের প্রতিবাদে। যদি তিনি এটা করতেন? তাহলে তিনি তখনও পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারেন নি একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারী হিসেবে এবং ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ধ্বংস বা পতন ব্যাখ্যাত হয়নি, তখন পর্যন্ত ভারতীয় নিরপে(ব্যাবসার দৃষ্টিকোণ থেকে আর দেশীয় উদ্যোগের দ(তার খামতির দিক থেকে। ভারতীয় উদ্যোগগুলির ব্যাপারে আগেই বলা হয়েছে ব্রিটিশ নীতির বি(দ্ধে ভারতীয় আন্দোলনের নথি অবশ্যই এ-সময় উপস্থিত হয়েছিল, এই প্রমাণ করতে যে, ভারতীয় বাণিজ্য বস্তুত কী ধ্বংস হয়েছিল? সম্পদ নিষ্কাশনকে কেন্দ্রে রেখে রামমোহন বলেছিলেন, ইওরোপীয়রা জড়ো করেছিল যে সম্পদ ভারতবর্ষে, তাই তাদের অবশ্যই উৎসাহিত করেছিল ভারতে বাস করতে। সুতরাং সম্পদ কোনও ভাবেই ভারতবর্ষের বাইরে যায়নি।

১৮৩১ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর কলকাতার একটি আবেদনপত্রে দেখা গিয়েছিল, ব্যাবসার (ে ত্রে His Majesty's Privy Council-এর সম্মানীয় লর্ড কে লেখা—সই করেছিলেন ১১৭ জন দেশীয় অভিজাত, দেশীয় দাবি খুঁজে পেয়েছিল এক উজ্জ্বল অভিব্যক্তি(—সম্প্রতি বছরগুলিতে আপনার আবেদনকারীরা আরম্ভ করেছিল তাদের ব্যাবসা, যা প্রায় অতিত্র(ম করে গিয়েছিল বাংলায় গ্রেট ব্রিটেনের বুনে তোলা বিষয়গুলি উপভোগ, কোনও রকম রাজস্ব ছাড়াই খাজনা সংগ্রহ করা তার ওপরে দেশীয় কাঠামোর সুর(া। তারা অতঃপর এই প্রার্থনা মেনে নিয়েছিল British দের সুযোগ সুবিধার প(ে এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে অনুনয় বিনয় করেছিল কর্তৃপ(ে র কাছে রাজস্ব মুক্ত(বাংলার সূতী ও সিল্কের ব্যাবসা যেন গ্রেটব্রিটেনে করতে অনুমতি দেওয়া হয়। British জিনিসপত্র যা বাংলায় উপভোগ্য হয়েছিল তার ওপর একই হারে দাম ধার্য করা হয়।

মার্টিন-এর Anglo-Eastern Empire-এ আর একটি কৌতূহলদ্দীপক আবেদন উদ্বৃত্ত হয়েছিল। এই আবেদন পত্রে সা(র করেছিলেন বাংলায় বসবাসকারী একদল ধনী ব্যক্তি(। এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, আবেদনকারীরা এবং বিশেষভাবে অনেকটাই দেশীয় উৎপাদনকারী শ্রেণী অর্থাৎ শ্রমিকেরা ইতিমধ্যে নিদা(ণ কষ্ট ভোগ করছিল, ব্যাবসা-বাণিজ্যের এই ধরনের নীতির ফলে। যার সম্বন্ধে আবেদনকারীরা বলেছিলেন, ইংরেজ কাউন্সিল যে কাজে এগিয়ে আসেন নি। ঐ দেশের উৎপাদনের দিকে যা প্রসারিত ছিল না। যেখানে সমস্ত উৎসাহ দাঁড়িয়েছিল ইংলন্ড থেকে রপ্তানির ওপর, ঐ সকল দেশের বৃদ্ধি ও বৈদেশিক উৎপাদনে যেমন ইংরেজ শিল্পের (ে ত্রে। যেখানে বহু সহস্র ঐ দেশীয় মানুষেরা যারা কিছুদিন আগেই তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করতো সূতীর বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে, তারা খাদ্যহীন হয়ে পড়েছিল ফলে সুযোগ সুবিধা যোগানো হয়েছিল আমেরিকার উৎপাদনে এবং ইংলন্ডের শিল্প উৎপাদনের কারখানা গুলিতে। এবং চিনির ব্যাপারে যেখানে উৎপাদনের (ে ত্রে আবেনদকারীদের ভূমিকা অবশ্যই সরে গিয়েছিল, সেইসঙ্গে ইংলন্ডে প্রচুর রাজস্বের ভার যেমন কার্যকরী হয়েছিল পূর্বভারতীয়দের বি(দ্ধে শিল্পের বাজার সংকুচিত হওয়া। যখন বিশেষ ধরনের পণ্যদ্রব্যের পালা এসেছিল।

১৮৩৫ সালের ৫ জানুয়ারী রসিক কৃষ(মল্লিক টাউন হলে তাঁর অগ্নিস্রাবী বক্তৃ(তায় ১৮৩৩ সালের সনদের তীব্র নিন্দা করেছিলেন, যার থেকে জনমতের পটভূমি তৈরী হয়েছিল। ''এটা পাস হয়েছিল ভারতের লাভের জন্য নয় বরং

ভারত ভাণ্ডারের সত্বাধিকারীদের জন্য এবং ইংলন্ডের সাদা জনগনের লাভের জন্য। এই অঞ্চলে বসবাসকারী কয়েক ল(লোকের কল্যাণের জন্য তাদের চিন্তা ছিল না... যদি আমাদের কল্যাণের কথা তাদের ভাবনায় থাকতো, তাহলে কেন লবণ ও আফিমের একচেটিয়া ব্যাবসা মুছে যায়নি?.... বৃথাই কি আমি তাকিয়েছি কোনও খন্ডবাক্যের জন্য যা কিনা বলছে ব্যাবসার ওপর থেকে বাধা অপসারনের কথা। ...আমি বলতে পারি না, কলকাতার ব্যাবসায়ীদের উদ্যোগ কি হতে পারে, কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য যদিও এই কড়াকড়ি অপসারিত হয়ে ছিল যার বশবর্তী ছিল ভারতীয় শিল্পের শ্রমিকেরা। যদি এই দেশ তার (মতা এবং সম্পদে সৌভাগ্যশালী আর বর্ধিত না হয়ে থাকে, তার থেকেও বেশী এর আগে সে যা ছিল।'' একই প্রতিধ্বনি আমরা ল(্য করি কিশোরীচাঁদ মিত্রের গলায়, যখন 1843 সালে হিন্দু থিওফিলানথ্রোপিক সোসাইটির সূচনা সন্দর্ভে ঘোষনা করেছিলেন—আমি বোধহয় প্রথম ব্যাক্তি(যে দৃঢ়কণ্ঠে সংকীর্ণ ও অদুরদর্শী আমাদের উচ্চ ব্যবসায়ীদের নীতির প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সার্বভৌম যৌথ তহবিল সমর্থন করেছিল তাদের লবন ও আফিমের একচেটিয়া ব্যাবসার বিলোপসাধন। এই সুবিন্যস্ততার মধ্যে দিয়ে দেশীয়রা অংশগ্রহণ করতে পারে শৃঙ্খল মুক্ত(বাণিজ্যের সুবিধার্থে।...''

আরও উত্তেজিত ভাষণ আমরা চন্দ্রনাথ বোসের ভাষণে পাই। যখন তিনি ১৮৬৯ সালের Social Science Association'-এ ভাষণ দেন—এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষ বস্তুত পূর্বদিকের ইংরেজ সভ্যতার ''Hewer of work and drawer of water'' কাষ্ঠ এবং জল সংগ্রাহক বাংলা একবার জানুক যে বস্ত্র যে পরিধান করে, যে কাগজের ওপর সে লেখে, যে ছুরিতে সে কাটে, দীর্ঘকাল ধরে তা কখনই ইংলন্ড থেকে প্রস্তুত হয়ে আসতে পারে না... তখন ইংলন্ড নিজেই তার বন্ধুত্বের জায়গা থেকে আরও ঘনিষ্ঠ আরও সৎবুদ্ধিযুক্ত(হয়ে উঠবে বর্তমানের থেকে এবং তখনই ঐ বন্ধুত্ব একটা খোলামেড়া পারস্পরিক সম্মানের জায়গা থেকে হবে, যে বন্ধুত্ব ছাড়া এই বিষয়টা হয়ে উঠবে অসার্থক। আত্মবিশ্বাসের শক্তি(ও আত্মসম্মানে অভিযুক্ত(এইসময় দেখাচ্ছে স্বদেশীবাদের বীজ বপনের কাল বাংলায়।

এ বিষয়ে অপবাদপূর্ণ জোরালো বক্তৃ(তা আমরা ল(্য করেছিলাম ভোলানাথ চন্দ্রের ভাষায়—ব্রিটিশ বাণিজ্যিক নীতির বি(দ্ধে, আমাদের নথিপত্র অনুযায়ী তাঁর প্রথম আহ্বান আন্দোলনের এবং যা খুব ঠিক সময়ে স্বদেশী জন্মকান্নার মধ্যে সম্ভাষিত হয়েছিল। ভোলানাথ লিখেছিলেন—এই লুণ্ঠন নগ্ন হয়েছিল, সত্যকে ছদ্মবেশ পরিয়েছিল। আমাদের কৃষিজীবিদের সম্পূর্ণ অবস্থাকে নিম্নতর করতে চেয়েছিল ইংরেজ।

আসুন আমরা গ্রহণ করি শিল্পের এবং বাণিজ্যের শি(া। অনুমতি দেওয়া হোক প্রশাসনে অংশগ্রহণ এবং আমাদের নিজেদের শুল্কের মূল্যতালিকা গঠন—যার সঙ্গে সম্ভবত কিছুটা স্বদেশীকতার সূত্রপাত বিদেশী জিনিসপত্র কেনার মধ্যে দিয়ে, ভারতবর্ষের সন্তানরা প্রমাণ করবে পৃথিবীর কাছে যে সময়োচিত দূরদর্শিতা তাদের ছিল সাধারন কৃষিজীবী হিসেবে অথবা তারা কোনভাবে পারেনা ম্যানচেস্টারের সুতিবস্ত্র শিল্পকে সিংহাসনচ্যুত করতে এবং আবারও তারা তাদের কর্তৃত্বকে স্থাপন করল সুতির শিল্পের জগতে।''

British বাণিজ্যিক নীতিকে প্রকাশ্যভাবে সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন—এটা হতে পারে সারাংশ ছিল একটি নীতি হিসেবে পুরোপরি এবং বিশুদ্ধ স্বার্থ এবং কোনভাবেই তা রাজস্ব নয়। প্রথমেই নিবারক, পরবর্তী সময় আত্র(মনকারক, তারপরে দমনকারক এবং এটা একদম শেষে হয়ে ওঠে দমন(ম। দেশীয় ল(কে বেধে ছিল যে কোন বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য। এর নামই প্রমাণ করছে যে একটা মুক্ত(বাণিজ্য। বস্তুত এটা তুলে ধরেছিল বিশাল একচেটিয়া ব্যবসা।

স্বদেশী আন্দোলনের গু(আরো বলেছেন,— দেশীয় ইংরেজি এবং দেশী পত্রপত্রিকাগুলি অবশ্যই জোরের সঙ্গে স্বয়ংভর গ্রামীণ bank. দেশী mill. Native chamber of commerce প্রদেশগুলিতে স্থাপনের কথা বলেছিল তারা

অবশ্যই প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করেছিল বিদেশী দ্রব্যের প্রানহীন অভ্যাসকে অধিক পছন্দ ঘরে তৈরী জিনিসপত্রের (ে ত্রে। তারা অবশ্যই নিজকে অস্বীকারের শৃঙ্খলার পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করেছিল এবং দেশাত্ববোধক চিন্তার অনুশীলন করেছিল। তারা অবশ্যই সংগ্রহ করেছিল এবং সংকলিত করেছিল ভারতীয় শহুরে জীবনের অনুপুঙ্খ জনগনের মনোযোগ আকর্ষনের জন্য। আমাদের দেশের তাঁতী, কর্মকার এবং প্রযুক্তি(শ্রমিকদের দুর্দশাকে তুলে ধরার জন্য। তারা অবশ্যই চিহ্নি(ত করেছিল প্রবল পরিমাণ এবং ত্র(মবর্ধন বাড়তে থাকা ভারতীয় শ্রমিকদের শ্রমের ওপর লাভের থেকে আসা সম্পদ নিস্কাশনের, তারা দেখিয়েছিল দেশ দিনের পর দিন দরিদ্র হয়ে পড়ছে এবং পুরোপুরি প্রকাশ্যে এনেছিল পরিসংখ্যানগত প্রবঞ্চনা কর্তৃপ(ে র, তারা অবশ্যই অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে চেষ্টা করেছিল ওই নীতির ধ্বংস সাধন যা যোগ করছে আমাদের রাজনৈতিক দাসত্ব যা খুব বেশী করে আমাদের দেশকে শিল্পের দাসত্বে পরিনত করেছিল।

কোনরকম বলপ্রয়োগ ছাড়াই, কোনরকম অবাধ্যতা ছাড়াই কোনরকম আইনগত সাহায্যের প্রার্থনা ছাড়াই। এটি শায়িত ছিল সম্পূর্ণভাবে আমাদের (মতা থেকে হারানো অবস্থাকে ফিরে পাওয়া। এটা আমাদের কাছে কোন অপরাধ ছিল না, যা একমাত্র আমরা গ্রহণ করেছিলাম, অত্যন্ত কার্যকরী অস্ত্র হিসেবে, নৈতিক বি(দ্ধতা...আসুন আমরা ব্যবহার করি সেই কার্যকরী অস্ত্রকে দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা যাতে কোন ভাবেই England-এর জিনিসপত্র উপভোগ করা যায় না।''

কোনভাবেই আশ্চর্যের নয় মূল গ্রন্থপাঠ যেমন স্বদেশী ইস্তেহার। অর্থাৎ যদি পরবর্তী সময় স্বদেশীরা এটাকে তাদের পরবর্তী কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এইভাবে প্রথমদিকের ব্যবসা এবং শিল্পের প্রধান কর্মচারীদের চেষ্টা এবং ত্র(মান্বয়ে চলে আসা দেশীয়দের আন্দোলন হচ্ছে এর উজ্জ্বল সা(্য R. C. Dutt যা মৌলিকভাবে দেখিয়েছেন আমাদের ব্যবসা এবং শিল্পের ধ্বংস। এইভাবে তিনি দেখিয়েছিলেন বাস্তব তথ্য এবং কোনভাবেই ওকালতি করেননি জাতীয়তাবাদী চিন্তার সপ(ে যা তার সমালোচকরা বলেছেন।

এখানে আরও একটা অবশিষ্ট গুরত্বপূর্ণ ল(ণ বা বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। এটা সন্দেহজনক ছিল যদি ভারতবর্ষ প্রতিযোগীতা করত। শিল্পোদ্যোগী England-এর সঙ্গে, এমনকি পুরোপুরি বিভেদমূলক নীতি ছাড়াই। এখানে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে, ভারতবর্ষের ব্যবসা এবং শিল্প অবশ্যম্ভাবীভাবে ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু ভারতীয় উদ্যোগ কখনওই একটা স্বচ্ছ পরী(ার মধ্যে যায়নি। সম্পদের সঙ্গে আদেশ, ভারতবর্ষ অর্জন করেছিল বাণিজ্যিক উন্নতির একটি সুস্থ মান, এমন কি যদি শিল্প বিপ্লবের দ্বারা সৌভাগ্যশালী নাও হতো। পর্যাপ্ত ভাবে তার জায়গাটিকে ধরে রাখতো। তার শক্তি(র সঙ্গে নিজস্ব মূল্যতালিকা গঠন, বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সে যথাযথভাবে মুখোমুখি হতে পারতো। মুক্ত(রাষ্ট্রের সুযোগকে সে অস্বীকার করেছিল। এটি অস্বীকার করা কদাচিৎ সম্ভব ছিল যে, ভারতবর্ষ ছিল নিদা(ণ ভাবে ভুল যাইহোক এমনকি ইংরেজ শিল্পবিপ্-ব তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছতে ভারতবর্ষ থেকে অত্যধিক পরিমাণে সম্পদ আহরণ করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জাতীয়তাবাদের কালে অবশিল্পায়নের ঘটনা তুলে এনেছিল নানা বিতর্ক। G. V. Joshi, M. G. Ranade, Debadhai Naoroji, R. C. Dutt এবং B. D. Basu ছিলেন আদি জাতীয়তাবাদী যারা প্রথম তাদের বক্তৃ(তায় এবং লেখালেখিতে আলোচনা করেছিলেন কুটির শিল্পের ধ্বংসের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতিতে এবং একইভাবে জনগণকে সচেতন করেছিলেন। R. P. Dutt একজন মার্কসবাদী লেখক একই দৃষ্টিকোণ থেকে অবশিল্পায়নের বাপারে লেখালেখি করেছিলেন।

পেশাদার ঐতিহাসিক এবং অর্থনীতিবীদের লেখায় আমরা বিতর্কের আর একটি ধারা ল(্য করি। তাঁরা যে সকল কারণ উত্থাপিত করেছিলেন তাদের ভাবনা চিন্তায় তার থেকে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি খুব একটা তফাৎ ছিল না। D. R. Gadgil এদের মধ্যে সম্ভবত প্রথম তার্কিক ছিলেন। পরবর্তী সময় A. Sarda Raju, R. D. Choksiy, H.

R. Ghosal এবং N. K. Sinha বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন(কিন্তু এদের মধ্যে কেউই বিষয়টি যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেননি। ১৯৬০-এর দশকে অবশিল্পায়ন বিতর্ক গ্রহণ করেছিল একটি নতুন দিক। যখন Daniel Thorner. M.D Morris, Bipan Chandra, Tapan Ray Chowdhury, Toru Matsui এবং অন্যান্যরা এই বিতর্কে অংশ নিলেন। Daniel Thorner-কে অনুসরন করে বলা যায় যে কুটিরশিল্পের ধ্বংসের যথাযথ প্রমাণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

সেখানে একইভাবে কোন পরিষ্কার নির্দেশ নেই জনসংখ্যার হ্রাস পাওয়ার যা নির্ভর করেছিল শিল্পের ওপর। পু(ষ জনসংখ্যার একটা অংশ নির্ভর করছিল অথবা শিল্পগুলি নিশ্চল হয়ে পড়েছিল মোটামুটিভাবে ১৪.৮ ল(। যে বিরাট সংখ্যক জনগণ কৃষিকার্যের ওপর নির্ভর করে থাকত তার বৃদ্ধি হয়নি। Thorner বলেছেন জাতীয়তাবাদীরা বহিরঙ্গের বাণিজ্যের ব্যাপারে ভীষণভাবে নির্ভর করেছিল পরিসংখ্যানের ওপর যা নির্দেশ করছিল ঐতিহ্যগত ভারতীয় সুতির রপ্তানীর ভেঙে পড়া এবং অতি দ্রুত বাড়তে থাকা ল্যাঙ্কাশায়ার-এর বস্ত্র আমদানি। কিন্তু এটা কখনওই গঠন করতে পারেনি একটি নির্দিষ্ট প্রমাণ মোট জাতীয় উৎপাদনের ধ্বংসের।

Morris D. Morris বলেছেন যে, অবশিল্পায়ন নিজে ছিল একটি অতিকথা। বা (Myth) তিনি বলছেন যে ম্যাঞ্চেস্টার রপ্তানি করেছিল একই সঙ্গে কোনো সুতো এবং বস্ত্র। যেখানে British প্রতিযোগিতা করছিল ভারতীয় হস্তচালিত তাঁত উৎপাদনের সঙ্গে বা machine-এ তৈরী কোনো সুতো দেখা যাচ্ছে শক্তি(শালী করেছিল দেশীয় হস্তচালিত তাঁতিদের প্রতিযোগীতামূলক অবস্থাকে। তাঁতিরা বিদেশ থেকে কম মূল্যে আনিত বোনা সুতোর থেকে লাভবান হয়েছিল। মাথাপিছু সুতিবস্ত্রের উপভোগ বেড়ে গিয়েছিল ১৮০০ থেকে ১৮৪৭ সালের মধ্যে অতঃপর হস্তচালিত জিনিসপত্রের যথাযথ চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। ফ্যাশানের পরিবর্তনের কারণে মহিলাদের মাথা পিছু বস্ত্রাদির ভোগও পরিবর্তীত হয়েছিল। তাছাড়াও এই British বস্ত্র কখনওই বিকল্প হতে পারে না সাধারণ ভারতীয়রা যে ধরনের বস্ত্রাদির চাহিদা করেছিল তার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত Morris বলেছেন যে বাংলার সুতিবস্ত্র শিল্প ছিল না খুব একটা উন্নতির অবস্থায় ১৮০০ সালের কাছাকাছি সময় এবং বাংলার কুটিরশিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে যায়নি ম্যাঞ্চেস্টারের ভারতীয় বাজারকে আত্মস্বাদ করার ফলে।

Morris-এর এই দৃষ্টিকোনটি অত্যন্ত কঠোরভাবে বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিল বিপান চন্দ্র, তপন রায় চৌধুরি এবং ত(মাতসুইয়ের দ্বারা। তাঁদের মতে Morris-এর যুক্তি(তে দেশীয় তাঁতিরা লাভপ্রাপ্ত হয়েছিল নিম্নমূল্যের আমদানিকৃত বোনা সুতোর দ্বারা, যা উপে(া করেছিল দুটি বিষয়— ভারতীয় সুতোকলের অবলুপ্তি এবং সমস্যা, wool-এর দ্রব্যের মূল্য কমে যাওয়ার কারণ ছিল যেমন England-এ শিল্পবিপ্-বের অধীনে ছিল যা দাঁড়িয়েছিল নতুন ধরনের প্রাযুক্তি(ক উদ্ভাবনের মধ্যে, উৎপাদনের মূল্য যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। যারা কুটিরশিল্প করত তাদের তুলনায়, এঁদের মূল্য অনেক কম ছিল। এই সমস্ত পন্ডিতদের মত অনুসারে বলা যায় যে, বিষয়টা হল মূল্য হ্রাসের প্রাযুক্তি(ক উদ্ভাবন শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নয় England-এও তার জায়গা নিয়েছিল। ল্যাঙ্কাশায়ারের উৎপাদকরা লাভবান হয়েছিল চরকা ও বয়নশিল্পের একইসঙ্গে মূল্য হ্রাসের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ভারতীয় সুতো কাটিয়ে ও তাঁতিদের (ে ত্রে পরিস্থিতিটা ছিল অন্যরকম। একদিকে, ভারতীয় চরকা কাটিয়েরা অত্যন্ত তিক্ত(কষ্ট স্বীকার করেছিল সস্তায় আমদানিকৃত সুতো আসার ফলে এবং বহু লোক তাদের পেশা ছেড়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে তাঁতিরা একই সঙ্গে খুব বেশী লাভ করতে পারে নি। যেমন Britian-এ কোনভাবেই সুতো বোনার মূল্য কমে যায়নি। যদিও তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। আমদানিকৃত কম মূল্যের বস্ত্রাদির সঙ্গে। বিপরীত দিকে মরিস যা বলেছেন, সেখানে বেঁচে থাকার পরিস্থিতির মধ্যে কদাচিৎই উন্নতি ঘটেছিল।

এখানে তাৎপর্যপূর্ণ W. W. Hunter-এর 'Statistical Account of Bengal' যা ১৮৭০-এর দশকে লেখা

হয়েছিল। যা একটি সমৃদ্ধশালী হস্তচালিত তাঁত শিল্পের পরিস্কার ছবি দিতে পারেনি। প্রচুর পরিমাণ ছড়ানো ছিটনো তথ্য দেওয়া হয়েছিল সরকারী উৎসের ব্যাপারে যেমন জনগণনা এবং দুর্ভি(র প্রতিবেদন এবং অঞ্চলিক শিল্প জরিপের (ে ত্রে ১৯০৮ সালে বাংলায় J. G. Cumming এর দ্বারা এগুলি সম্পাদিত হয়েছিল। তারা নিশ্চিত করেছিল একই ছবি যখন আদমশুমারীর তথ্য ব্যবহৃত হয়েছিল তুলনার জন্য। একটি ১৮০৯-এর জন্য অন্যটি ১৮৮০ জন্য, তারা হয়তো নথিভুক্ত(করেনি শিল্প থেকে কৃষিতে ঠিকমত বিসরন বা বিস্তার এর মধ্যে সেখানে অবশ্যই ছিল দুর্ভি(এবং মহামারী যা কিনা মুছে দিয়েছিল বিরাট সংখ্যক জনসংখ্যা যা আনয়ন করছে জনসংখ্যার পূর্বস্থিতি শিল্পে এবং কৃষিতে। যা ড্যানিয়েল থরনার-এর ভ্রমের দিক নির্দেশ করছে।

A. K. Bagchi-র ১৮০৯-১৯০১ গাঙ্গেয় বিহার নিয়ে অব-শিল্পায়নের অনুপুঙ্খ গবেষনা মূলতঃ দাঁড়িয়েছিল বুকানন—হ্যামিলটন-কৃত উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পরী(নের বা জরিপের উপর নির্ভর করে এবং ১৯০১-এর আদমশুমারী প্রতিবেদনের ওপর ভর দিয়ে।

প্রথমতঃ বাগচী যুক্তি(দিয়েছিলেন যে, এটা শুধুমাত্র বিহারের হস্তচালিত তাঁত শিল্পই নয়। যেটা জড়িয়ে ছিল মহাদুর্যোগের সঙ্গে তাছাড়াও অন্যান্য ঐতিহ্যগত শিল্পগুলি, যা আরও সহ্য করেছিল মহাদুর্যোগপূর্ণ (য়, একই সঙ্গে তাদের উৎপাদন ও কর্মনিযুক্তি(। রঙ শিল্পের উৎপাদন নেমে এসেছিল, যা পর্যায়ত্র(মে দেখিয়েছিল বিরাট সংকোচন বা হ্রাসপ্রাপ্তি বিহারের সূতী চাষের (ে ত্রে। নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ সূতী শিল্পের (ে ত্রে যেমন, শতরঞ্জি তৈরী, কার্পেট বোনা, ইত্যাদি। টিকে ছিল যদিও কোনটাই ছিল না উজ্জ্বল স্তরে। দ্বিতীয়ত, বাগচীর ভাষায়, গয়ার এবং সাহাবাদে'র কাগজ শিল্প চুক্তি(করেছিল বিলোপসাধনের কেন্দ্র পর্যন্ত।

শোধিত পরিশুদ্ধ চিনি শিল্প গিয়েছিল একটা কালচত্রে(র মধ্যে দিয়ে। এটা উঠে এসেছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। এটা সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল সাহাবাদে বিশেষত ১৮৭০ পর্যন্ত, তারপর এটি ধীরে ধীরে (য়ে যেতে শু(করে। তৃতীয়ত, সস্তায় জাভা এবং মরিশাস থেকে চিনির আমদানি বাড়ছিল যা মাতগুড় বা গুড় তৈরীর (ে ত্রে অন্তরায়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যা ছিল প্রাথমিকভাবে ব্যাপক একটি কৃষি উৎপাদন। শেষ পর্যন্ত, বাগচী দেখেছেন, অবশিল্পায়নের পদ্ধতি চরিত্রগতভাবে পরোপুরি পরিবর্তীত হয়েছিল পূর্ণিয়ার মতো কয়েকটি জেলায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বেশীরভাগ উৎপাদনকারীরা যেমন তাঁবু তৈরী, গালার তৈর অলংকার, কাঁচের বাসনপত্র, দাঁতের মাজন, সিন্দুর, কম্বোল বোনা, ইত্যাদি শিল্প অনেক বেশি সংকুচিত হয়েছিল এবং কিছু কিছু শিল্প বাস্তব অর্থেই মুছে গিয়েছিল। এই (য় মুঙ্গেরের লৌহ শিল্পের (ে ত্রেও ঘটেছিল। বাগচী তাঁর ভাবনার উপসংহারে এসে দেখাচ্ছেন, গাঙ্গেয় বিহারে, সেখানে ঘটেছিল জনসংখ্যার শতকরা (য় যা নির্ভর করছিল শিল্পগুলির ওপর ১৮০৯-এ ১৮৬০ মিলিয়ন থেকে ১৯০১-এ ৮.৫ মিলিয়ন পর্যন্ত এবং এই বিশাল ধাক্কা নেমে এসেছিল চরকা কাটিয়ে ও তাঁতিদের ওপর ১৮০৯ সালে ৬২.৩% থেকে ১৯০১-এ ১৫.১% পর্যন্ত।

ইরফান হবিব ১৯৮৫ সালে 'Modern Asian Studies' নামক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছেন, বাগচীর বি(-ষণ যেমন অখন্ডনীয় এবং প্রকৃতই ভারতের অব-শিল্পায়নের সম্পর্কিত বাদানুবাদের (ে ত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই মীমাংসনীয়।

একজন অষ্ট্রেলিয়ান অর্থনীতিবিদ মারিকা ভিকজিয়ানি, যাইহোক আপত্তি জানিয়েছিল বাগচী'র উপসংহারে এবং সমালোচনা করেছেন তাঁর পদ্ধতির। ভিকজিয়ানি এই ''Indian Economic and Social History Review'' প্রবন্ধে লিখছেন বাগচীর অনুধ্যান তুলে এনেছে কিছু সংজ্ঞার সমস্যা এবং পরিসংখ্যানের তুলনামূলকতা। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বা অনুমান করেছেন, বিহারের গাঙ্গেয় জেলাগুলির জরিপের যাথার্থ্য যা করেছিলেন বুরানিন হ্যামিলটন বাগচী যা তুলনা করেছিলেন ১৯০১ সালের আদমশুমারীর তথ্য দিয়ে এবং এই ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে তাঁর

অনুসন্ধান। বাগচীর গবেষণা, বলা যেতে পারে, দেখাচ্ছে গাঙ্গেয় বিহারের সাধারণ ধারা। এটা যেমন বাংলার প্রদেশ সঙ্গে অর্ন্তভুক্ত(বিহারে ধ্বংসাত্মক পশ্চিমী বাণিজ্যবাদের প্রভাব যা নগ্নভাবে আত্র(মণ করেছিল। বুকানন হ্যামিলটনের জরিপ যদিও সব(ত্রে যথাযথ নয়, আমাদের দিয়েছিল সবচেয়ে সেরা লভ্য পরিসংখ্যানগত তথ্য। এর ফল অনেক বেশী বি(োসাযোগ্য অন্যান্য ধরনের মূল্য নিরূপনের থেকে, যা শুধু মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে গঠিত। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সমকালীন পর্যবে(কদের ধারণার, তাছাড়া ঘনিষ্ঠ মিল পাওয়া যায় এই সকল পরিসংখ্যানগত নির্ধারিত পরিমাণের সঙ্গে।

সাম্প্রতিককালে তীর্থঙ্কর রায় দেখিয়েছেন যে, অব-শিল্পায়ন ব্যাখ্যা করেছে কার্য নিয়োগের (য় কারণ প্রযুক্তি(গত অনুপস্থিতি ভারতীয় পণ্য ও ব্রিটিশ পণ্যের প্রতিযোগিতার কারণে। যাইহোক এটি একটি অসন্তোষজনক ব্যাখ্যা চারটি কারণের জন্য। ১. তিনি সাধারনীকরণ করেছিলেন একটি মাত্র উদাহরণ থেকে, যেমন বলা যায় হাতে তৈরী সূতীবস্ত্র। ২. যেখানে নানা বিভাগ ছিল, যেখানে কর্মনিযুক্তি(ভেঙে পড়েছিল যন্ত্রপাতির সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতির ফলে। ৩. অব-শিল্পায়ন হচ্ছে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে পরস্পর বিরোধী এবং কুটির শিল্পের মধ্যে আয়ের বৃদ্ধি। ৪. এটা ব্যাখ্যা করতে পারে না মজুরী শ্রমের পরিবর্তন অথবা নারী শ্রমের (য়।

রায় সিদ্ধান্তে এসেছেন, যে ব্রিটিশ যন্ত্রপাতি এবং ভারতীয় যন্ত্র সাধারনভাবে প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। (দ্র শিল্প পরিবর্তিত হয়েছিল বহিবঙ্গের প্রতিযোগিতার জন্য নয় বরং ভারতে বাণিজ্যিককরণের অন্তর্গত প্রতিযোগিতার কারণে। রায় বোধহয় উপে(া করেছেন উপনিবেশিক কাঠামো এবং কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যাবসা এবং বলেছেন মুক্ত(বাজারের গতি সম্বন্ধে।

দেশীয় শিল্পের ধ্বংস ও (য় অবশ্যই স্থান নিয়েছিল যেমন ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় অর্থনীতির ওপর শু(করেছিল শক্ত(হাতে লাগাম ধরতে। কুটিরশিল্প বাধা পড়েছিল গুদামঘরে মেশিনে তৈরী পণ্যের পূর্বে ঠিক যেমন এটা করা হয়েছিল পশ্চিমে, আধুনিকীকরনের মূল্যের অংশ হিসেবে। ইংলন্ডে এই ক্লেশের কারণ ছিল কুটিরশিল্পের (য় বা বিকল্প ভারসাম্য তৈরী করেছিল আরও ভালো কর্মনিযুক্তি(র মধ্যে দিয়ে এবং ফ্যাক্টরি শিল্পে আয়ের উৎপাদনী প্রভাবের ফলস্বরূপ। অসমান প্রতিযোগিতার ভার কাঁধে নিয়েছিল শ্রমিক কারিগরেরা।

৭.২ গ্রন্থপঞ্জি

১. আর. সি দত্ত—ইকনমিক হিষ্টরি অব ইন্ডিয়া Vol–I and II

২. বিপান চন্দ্র—দি রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অফ ইকনমিক ন্যাশানালিজম ইন ইন্ডিয়া

৩. বিপান চন্দ্র—মডার্ন ইন্ডিয়া

৪. বিপান চন্দ্র—তপন রায়চৌধুরী, ত(মাৎসুই(রি ইনটারপ্রিটেশন অব নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি ইন্ডিয়ান ইকনমিক হিষ্টরি।

৫. সি. পালিত— নিউ ভিউ পয়েন্টস্ অন দ্যা নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল

৬. অ(ণ দাশগুপ্ত, অলক ঘোষ—অবশিল্পায়ন (বাংলায়)

৭. এ. কে বাগচী—প্রাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট ইন ইন্ডিয়া

৭.৩ অনুশীলনী

১. অবশিল্পায়ন কাকে বলে? এবং তা ভারতীয় দারিদ্র সমস্যার সাথে কি ভাবে যুক্ত(?

২. ব্রিটিশ শাসনকালে এই অব শিল্পায়ন কি ভাবে হয়? ভারতীয় বাণিজ্য ব্যবস্থা এই অবশিল্পায়নের ফলে কি ভাবে (তিগ্রস্ত হয়?

৩. সম্পদ নিষ্কাশন কাকে বলে? এই নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক আলোচনা কর।

৪. সম্পদ নিষ্কাশন তত্ত্ব (Drain of Wealth) নিয়ে দাদাভাই নাওরোজির মতবাদ আলোচনা কর।

একক ৮ ❑ ভারতে রেলপথের সূত্রপাত

গঠন

৮.০ ভারতবর্ষে রেলপথের সূত্রপাত
৮.১ আধুনিক শিল্পের বিকাশ
৮.২ গ্রন্থপঞ্জি
৮.৩ অনুশীলনী

৮.০ ভারতবর্ষে রেলপথের সূত্রপাত

ভারতবর্ষে রেলপথ-এর সূত্রপাত হওয়ার আগে, এ দেশে যানবাহন ব্যবস্থা কোনোভাবেই বুনে ওঠেনি। অঞ্চলগুলি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং একান্তে ছিল। নদীতীরবর্তী বাণিজ্য এবং সমুদ্রে উপকূলবর্তী বাণিজ্য ছাড়াও, অঞ্চলগুলির মধ্যে কোনরকম যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। বেশিরভাগ অঞ্চলগুলিতে, গ(র গাড়িতে করেই প্রচুর জিনিসপত্র সরবরাহ করা হত। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি নিজেদের প্রধান চাহিদাগুলির (ে ত্রে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সেইসব অঞ্চলে জিনিসপত্র এবং কাজকর্ম বন্ধ থাকার ফলে ভারতীয় বাজার গড়ে ওঠেনি। Lord Dalhousie ভারতে রেলপথের সূত্রপাত ঘটানোর মধ্যে দিয়ে যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি একটি রাজনৈতিক এবং শিল্পপণ্যোৎপাদী আবহাওয়া তৈরী করতে উৎসাহী ছিলেন যা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের (ে ত্রে সহায়ক হয়ে উঠবে। ১৮৫৩ সালে রেলপথের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি রেলপথ নির্মাণের গু(ত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করেন।

এর প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সাম্রাজ্যের ওপর রাজনৈতিক একীকরণ তৈরী করা এবং তার ওপরে একাধিপত্য স্থাপিত করা। এর ফলে সরকার এ দেশ এবং দেশের মানুষদের সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। সামাজিক ঐতিহ্য এবং আর্থিক অবস্থার অবনতির ফলস্বরূপ দেশেব মধ্যে যে বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়েছিল সেই বিদ্রোহীদের দমন, আইন ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হয়, ভূমি রাজস্ব আরও মসৃণভাবে সংগৃহীত করার জন্য সরকার সেনাবাহিনীকে রেল পথের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত করার কথা চিন্তা করেছিল। শীঘ্র প্রসারিত করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে সবসময় প্রস্তুত রাখতে হত। শতাব্দীর প্রথম থেকেই ব্রিটিশ শাসনের বি(দ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল যা বিশাল আকার নেয় ১৮৫৭ সালে। এই বিদ্রোহ রেলপথ নির্মাণকে আরও ত্বরান্বিত করার এক গু(ত্বপূর্ণ এবং একক প্রচেষ্টা ছিল যা সৈন্যবাহিনীর যাতায়াতের সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছিল।

কিন্তু আর্থিক উদ্দেশ্য কম গু(ত্বপূর্ণ ছিল না। ঔপনিবেশিক সরকার ভারতবর্ষকে শিল্পপণ্যোৎপাদী ব্রিটেনের কৃষিকার্যের খামারে পরিণত করতে চেয়েছিল। ভারতের কাঁচা দ্রব্য, কৃষি শস্য, এবং খনিজ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে বন্দরে নিয়ে আসা হত— জাহাজবন্দী হয়ে ব্রিটিনে যাওয়ার জন্য। একইভাবে ইংল্যান্ডের তৈরী জিনিসপত্র ভারতের বাজারে বিক্রি(র জন্য আসত। এই বাজারকে প্রস্তারিত করতে গেলে রেলপথের দ্বারাই বন্দরের সঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোকে যোগ করা জ(রি ছিল। এর সঙ্গে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ভারতবর্ষকে তাদের মূলধনের এক বিনিয়োগ (ে ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ তাদের প্রধান শর্ত ছিল। এই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণই ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণে সাহায্য করেছিল।

ঔপনিবেশিক ভারতে রেলপথ সম্প্রসারণ ঘটেছিল বিভিন্ন প্রকারে। রেলপথে ব্যক্তি(গত বিনিয়োগ করার জন্য সরকার জামানত ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল। এই জামানত ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার, রেলপথ নির্মাণের জন্য বেসরকারী সংস্থাগুলোকে অবাধ জমি প্রদান করে। সংস্থাগুলির মোট বিনিয়োগের ওপর সরকার ৫ শতাংশ বার্ষিক সুদ দিতে রাজি হয়। সরকার এটাও নিশ্চিত করে যে কোম্পানী এবং সরকারের মধ্যে লভ্যাংশগুলি সমবন্টন হবে। এটাও সম্মতি দেওয়া হয় যে সরকার ২৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে রেলপথ কিনেও নিতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে, ১৮৬৯ সালের মধ্যে ৪২৫৬ মাইল রেলপথ নির্মিত হয়।

এই জামানত ব্যবস্থা সরকারী রাজস্ব দফতরের ওপর প্রচন্ড আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে। ১৮৬৯ সালে সরকার নিজেই সরাসরি ভাবে রেলপথ নির্মাণে কাজে হাত দেয়। নতুন কর্মপন্থা অনুযায়ী সরকার যৌথভাবে রেলপথ নির্মাণ এবং পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৮৮০ সালে নতুন জামানত ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্র তার ভূমিকা ছেড়ে দেয়।

নতুন জামানত ব্যবস্থায় বেসরকারী সংস্থাগুলিকে রেলপথ নির্মাণের জন্য আবার হস্ত(েপ করতে বলা হয়। কিন্তু এসময়ে সরকার কৌশল এবং নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতেই রাখে। জামানাত ব্যবস্থার সুদের হার ৫ শতাংশ থেকে ৩.৫% কমিয়ে দেওয়া হয়। নতুন জামানত ব্যবস্থা ভারতে রেলপথ নির্মাণের গতিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ১৯০৫ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে ২৮ হাজার রেলপথ নির্মিত হয়। এই বছরই রেলপথ পরিচালনা আরও কার্যকরী করার জন্য 'Railway Board' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বি(েযুদ্ধ এই রেলপথ নির্মাণের গতিকে স্থিমিত করে দেয়। বি(েযুদ্ধের পরে রেলপথ নির্মাণের (েত্রে বেসরকারী সংস্থাগুলোকে বন্ধ করার জন্য জাতীয়তাবাদীরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ১৯২৫ সালে সরকার অনেক বেসরকারী সংস্থাগুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে এবং তাদের সরকারী মর্যাদা দেয়।

Railway Board আবার কাজ শু(করে এবং রেল বাজেট শু(হয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই কর্মপন্থা সচল থাকে। ৩৩ দিনে ভারতের মোট জায়গায় ৭.৮% রেলপথ ব্যবস্থার আয়ত্বে এসে পড়ে শুধুমাত্র প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি ছাড়া। প্রত্যেকটা কেন্দ্রীয় শহরে রেলপথ নির্মিত হয় এবং ৬৫,২১৭ কিলোমিটার রেললাইন ফেলা হয়।

ভারতবর্ষে রেলপথের একটা সাধারণ প্রভাবের সং(িপ্তসার হল ঃ

১. এই রেলপথ একটা জাতীয় বাজার তৈরী করে। গ্রামীণ এবং স্থানীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির অবনতি এবং সারা ভারতবর্ষব্যাপী উৎপাদন ভারতের আর্থিক জীবন যাত্রাকে এককে পরিণত করেছিল এবং ভারতীয় জনমানসের মধ্যে আর্থিক অবস্থার প্রতি এক সুদূর প্রভাব ফেলেছিল।

২. রেলপথ শুধুমাত্র একটা জাতীয় বাজার তৈরী করেনি, এটা ভারতীয় অর্থনীতি এবং বি(েবাজারের মধ্যে একটা যোগসাজশ তৈরী করতে স(ম হয়েছিল। এটা কৃষিশস্য উৎপাদনে এক অভূত শক্তি(প্রদান করেছিল এবং কৃষকদের আর্থিক সুযোগসুবিধার একটা রাস্তা তৈরী করতে সাহায্য করেছিল।

৩. এর সূত্রপাতের ফলে, ঘরোয়া এবং বি(ে বাণিজ্যের হার—দুই বেড়ে গেছিল এবং ভারত থেকে আমদানী এবং রপ্তানীর পরিমাণও বেড়ে গেছিল।

৪. রেলপথ নির্মাণ বেকারত্বের হার কমিয়েছিল। এবং চাকরির সুযোগ সুবিধা বাড়িয়েছিল। এইখানে বলা যেতে পারে যে লৌহ এবং ইস্পাত এবং কয়লা কারখানাগুলির পত্তন এই রেল ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত(। ভারতবর্ষে রেলপথের সূত্রপাত যানবাহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছিল এবং দেশের বিভিন্ন অংশগুলিকে একত্রিত করেছিল যা মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বি(দ্ধে জাতীয়তাবাদী অনুভূতি গড়ে তুলতে স(ম হয়েছিল।

ভারতে ব্রিটিশ দ্বারা পরিচালিত রেলপথ কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তা কার্লমার্কস, বিপান চন্দ্র, ড্যানিয়েল থরনার, ডি. এইচ. বুকানন, ইরফান হাবিব, ডি. আর. গ্যাডগিল প্রমূখ পন্ডিত ব্যক্তি(দের মতামত থেকে জানা যেতে পারে। ১৮৫০ সালে New York Daily Tribune নামক একটি প্রবন্ধে বলেছেন 'ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প-কারখানার পূর্বসূরি হচ্ছে এই রেলপথ ব্যবস্থা'। তাঁর মতে, এই রেলপথের সূত্রপাত রেল ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত(শিল্পকারখানাগুলো গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং সেইসব যন্ত্রপাতিগুলো কারখানার কাজে লাগানো যাবে যা রেলপথে সরাসরি যুক্ত(নয়। মার্কস এটাও বলেছেন, যে আধুনিক কারখানাগুলো ভারতবর্ষে বংশপরম্পরা ধরে হয়ে আসা শ্রেণী বিভাজনকে ভেঙে দেবে যা ভারতের জাত-পাত ব্যবস্থার মে(দন্ড। তাঁর মতে, ব্রিটিশরা এই রেলপথ ব্যবস্থা থেকে অনেক সুবিধে পেত। কারণ, রেল, যন্ত্রপাতি এবং যাত্রী পরিবাহী গাড়ী কোনো কিছুই ভারতে তৈরী হতো না, বরং ইংল্যান্ড থেকে আমদানী হত। সুতরাং ভারতের মানুষের অবস্থা অপরিবর্তনীয় ছিল। বিপান চন্দ্র দেখিয়েছিলেন যে রেলপথ নির্মাণ ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে, সংস্কৃতিতে এবং অর্থনীতিতে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু ড্যানিয়ের থরনার দেখিয়েছেন যে রেলপথের জন্য যে আর্থিক নীতি ভীরতবর্ষের দেশীয় আর্থিক উন্নতিতে সহায়ক হয়ে ওঠেনি। ডি. এইচ. বুকানন দেখিয়েছেন যে ব্রিটিশ পুঁজির সাহায্যে যেহেতু রেলপথ নির্মিত হত সে কারণে ইংল্যান্ড ভারতের (ে ত্রে উৎপাদনশীল দেশ হিসেবে পরিগণিত হত, কিন্তু ভারতবর্ষ নিজের (ে ত্রে তা হতে পারেনি কারণ সে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারত না। মার্কস তাঁর পূর্বের মতগুলোকে পর্যবে(ণ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে বিদেশী পুঁজির শাসনের ফলে ভারতের শিল্প কারখানাগুলো এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রধান দেশের এক অখন্ড অংশ হিসেবে পরিণত করবে এবং তাকে আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে, ইরফান হাবিব ১৯৭৫ সালে বলেছিলেন যে রেলপথ শিল্প বিপ্-বের অনুঘটক হিসেবে কাজ করার পরিবর্তে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। কিন্তু পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং ১৯৪৩ সালে বলেন যে রেলপথ ছিল আধুনিকশিল্পকারখানার পূর্বসূরী। ডি. আর. গ্যাডগিল দেখিয়েছেন যে ১৮৮০ সালের Famine Commission-এর রিপোর্ট অনুযায়ী সেইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুর্ভি(ে র জন্য মৃতের হার বেশি ছিল যেখানে রেলপথ পত্তন করা হয়নি। সুতরাং দুর্ভি(কে প্রতিরোধ করার অন্যতম কারণ ছিল রেলপথের সম্প্রসারণ। কিন্তু এই মতামতের সঙ্গে আমরা এক হতে পারি না কারণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগই এই দুর্ভি(ে র একমাত্র প্রধান কারণ। আসলে, ঔপনিবেশিক শাসন এই রেলপথের মাধ্যমে শস্যগুলোকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত করতে এবং মানুষের দ্বারা দূর্ভি(সৃষ্টি হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, রেলপথ সম্প্রসারণ এবং রেললাইন দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছিল এবং রাস্তা নির্মাণের মতই রেল সম্প্রসারণ বিভিন্ন বাজার এবং মেলার মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদেশী দ্রব্য সরবরাহ করতে সাহায্য করেছিল। সর্বোপরি, রেলপথ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক একীকরণের রাস্তা তৈরী করতে স(ম হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও এই রেলপথ নির্মাণ সত্যিই ভবিষ্যতে ভারতকে আরও শক্তি(শালী এবং আধুনিক দেশে পরিণত করেছিল।

৮.১ আধুনিক শিল্পের বিকাশ

শহরের হস্তশিল্প এবং গ্রামীণ কারিগর শিল্প আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে কৃষি এবং উৎপাদন শিল্পের শতাব্দী প্রাচীন সংযোগে ভাঙন ধরে যা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার এক অতি গু(ত্বপূর্ণ দিক। ভারতের পূর্বতন জাতীয় নেতাদের মতে শিল্প কারখানাগুলির শোচনীয় অবস্থাই ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও দূর্বল করে দিয়েছিল। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা যায় যে দেশীয় কারখানাগুলি ধ্বংসের ফলে অবনতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই

ধ্বংসের (তিপূরণ দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরমাণে আধুনিক যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা গড়ে ওঠেনি যা ভারতবর্ষে দারিদ্র ডেকে এনেছিল। R. C. Dutt'র মতে বিদেশী উপকরণে দ্বারা ভারতীয় উৎপাদন শিল্পের পদচ্যুতি হওয়া ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে সব থেকে দুঃখজনক অধ্যায়। দেশীয় শিল্প কারখানাগুলির উত্তরোত্তর অবনতি এবং নতুন শিল্পকারখানাগুলি গড়ে না ওঠার ফলে দেশের আর্থিক জীবনযাত্রা বিদেশী পুঁজিপতিদের দখলে চলে আসতে আরম্ভ করে এবং ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতবর্ষকে চাষাবাদ এবং কাঁচা দ্রব্যের উৎপাদনী দেশ হিসেবে চিহ্নি(ত করে। এই দ্রব্যগুলি ব্রিটিশ দালালদের দ্বারা ব্রিটিশ জাহাজবন্দী হয়ে যেত, এবং ব্রিটিশ দ(তা এবং পুঁজির সাহায্যে বস্ত্রে পরিণত হয়ে আবার রপ্তানি হত ভারতে স্থাপিত ব্রিটিশ খামারে এবং অন্যান্য জায়গায় ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সাহায্যে। এর ফলে চরম আর্থিক সঙ্কটে গড়ে ভারতবর্ষ। ভারতীয় নেতারা বিশ্বাস করেছিলেন যে ব্রিটিশরা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে দুদেশের মধ্যে অসৎ বাণিজ্যিক প্রতিযোগীতা সৃষ্টি করার ফলে ভারতের শিল্প কারখানাগুলির এত দ্রুত অবনতি ঘটেছিল। এই সূত্রে বলা যেতে পারে যে,... 'অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা অনেক উন্নত ছিল, এবং ভারতীয় উৎপাদন কৌশল আর শিল্প এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারত।' কিন্তু বিপান চন্দ্রের মতানুসারে, ঊনিশ শতকের শেষ ভাগে, বেশিরভাগ ভারতের দেশীয় শিল্প কারখানাগুলি হয় একেবারে ভেঙে গেছিল যা কোনোভাবেই পুন(দ্ধারের অবস্থায় ছিল না অথবা ভাঙনের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছিল।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ভারতবর্ষে অবাধে প্রবেশ করল বিদেশী পুঁজি। বেশি লাভের আশায় বিদেশী পুঁজিপতিরা ভারতীয় শিল্প কারখানার প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল। সস্তায় শ্রম এবং কাঁচা দ্রব্য খুব সহজেই পাওয়া যেত। শুধুমাত্র ভারতবর্ষ এবং তার আশেপাশে অঞ্চল একটা তৈরী বাজার প্রদান করত তা নয়, ভারতে ব্রিটিশ ঠিকাদারদের কাজে শাসকেরা উৎসাহ দিত এবং সমর্থন করত। এই মতকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যেতে পারে না যে ঊনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রথমে বিদেশী পুঁজি খুব সহজভাবেই বাণিজ্যিক কাজে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ভারতীয় পুঁজিকে। ভারতীয় পুঁজি যদিও পেছনের সারিতে ছিল তবু কোনোভাবেই একেবারে মুছে যায়নি। কার্যতঃ, দেশীয় পুঁজির স্বল্পতা এবং নতুন ে(ত্রে নিজেকে ঝুঁকিতে ফেলার অনিচ্ছা ভারতের শিল্প বিকাশের পথকে অনেক খর্ব করে দিয়েছিল এবং একইসঙ্গে ব্রিটিশ পুঁজি স্বদেশে ঠিকমত খাটাতে পারছিল না বলে, বিনিয়োগের জন্য নতুন পথ খুঁজছিল। ব্রিটিশ মতানুসারে ভারতের আর্থিক বিকাশের ফাঁকগুলোকে পরিপূর্ণ করার জন্য এবং শিল্প বিকাশের ে(ত্রে শক্তি(শালী লিভার-এর মত এই বিদেশী পুঁজি কাজ করতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে বিদেশী পুঁজিপতিরা কোনো আদর্শগত কারণে বিনিয়োগ করেনি উপরন্তু দেশীয় সংস্থাগুলোর বি(দ্ধে পার্থক্য করে ভারতের স্বাধীন আর্থিক বিকাশের পথ রোধ করাই তদের একান্ত চেষ্টা ছিল। তারা সম্পূর্ণ সচেতন ছিল যে ভারতকে কাঁচা দ্রব্যের উৎস এবং বাজার হিসেবে বিভিন্নভাবে কাজে লাগাতে পারবে তত(ণ পর্যন্ত যত(ণ ভারতবর্ষ অর্থবিনিয়োগকারী শিল্পে পরিণত না হচ্ছে। বিদেশী মুলধন ব্যবহার করার ে(ত্রে ভারতের জাতীয় নেতারা অনেকদিন পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত(ছিলেন। প্রথমে, রেলপথ এবং কৃত্রিম খাল, খনি, চাষাবাদ এবং আধুনিক শিল্পকারখানাগুলি বিদেশী পৃষ্ঠপোষকতার সাহায্যে আবির্ভুত হল, তখন দেশে বিদেশী পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ-এর বিরোধিতা আর সেভাবে দেখা গেল না। ঊনিশ শতকের শেষভাগে, যদিও খুবই (দ্র কিন্তু প্রভাবশালী ভারতীয় নেতৃত্বের একাংশ এই বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকে সমর্থন করতেন, কিন্তু অধিকাংশই এর প্রচন্ড বিরোধিতা করেছিলেন। দাদাভাই নওরোজির উদাহরণ দিয়ে এই জাতীয়তাবাদী ল(ণগুলোর এক পরিবর্তন দেখানো যেতে পারে। দাদাভাই নওরোজী বিদেশী পুঁজির এক গোঁড়া সমর্থক থেকে আস্তে আস্তে এর প্রবল সমালোচক এবং বিরোধী হয়ে গেছিলেন। তাঁর এবং আরো অনেকের মতে যেহেতু বিদেশী সংস্থাগুলি বেশিরভাগ ে(ত্রে ভারতীয় উপাদানকে বিকশিত করছিল, সেহেতু বিদেশী পুঁজিপতিরা এই বিকাশের ফলে অনেক সুযোগ সুবিধে বুনে তুলতে স(ম হয়েছিল এবং বাড়তি সম্পত্তি উৎপাদন থেকে ভোগ করত। বিদেশী পুঁজির দেশের অথবা মানুষের আর্থিক উন্নতির পেছনে কোনো অবদান রাখতে পারেনি। বাস্তবে দেখা যায় যে, বিদেশী সংস্থাগুলি

ভারতের অধিকাংশ মানুষকে পরিণত করেছিল দাসশ্রেণীতে যারা ব্রিটিশ এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের সেবার কাজে লাগত। বস্তুতঃ বিদেশী পুঁজির বিরোধীরা মনে করেছিলেন যে দেশে সত্যিকারের আর্থিক বিকাশ এবং উন্নতি সম্ভব হবে যদি ভারতীয় পুঁজিপতিরা শিল্পবিকাশের পদ্ধতিতে উন্নত করার জন্য নিজেরাই এগিয়ে আসেন, এ বিষয়ে এটা ল(ণীয় যে, তার জন্য ভারতীয় পুঁজিপতিদের প্রথম থেকেই শক্তি(শালী ব্রিটিশ পরিচালন সংস্থা এবং ব্যাঙ্কগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগীতার যুদ্ধে নামতে হবে। নির্দিষ্ট ব্যবসা শু(করতে গেলে, ব্রিটিশ পরিচালন সংস্থা যারা আগে থেকেই জমি দখল করে আছে তাদের কাছে ভারতীয় পুঁজিপতিদের নতিস্বীকার করতে হবে। জাহাজ এবং বীমা কোম্পানিগুলো, যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার জন্য ব্রিটিশ সংস্থাগুলি সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং অন্যান্যরা ভারতীয় সংস্থাগুলির বি(দ্ধাচরণ করেছিল। ঔপনিবেশিক সরকার এক নির্দিষ্ট প্রথা অনুযায়ী বিদেশী পুঁজিকে ভারতীয় পুঁজির থেকে সমর্থন করত। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের দ্বারা বিদেশী পুঁজি আদরিত হত ভারতবর্ষে এবং প্রত্যেক (ে ত্রে তারা বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারত, ছার পেত যেমন জামানত লাভ, মুক্ত(অথবা সস্তায় জমি এবং সুদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারী এবং আইনী ব্যবস্থা কায়েম করা হত, অন্যদিকে দেশীয় পুঁজিপতিদের প্রতি বীতরাগ প্রদর্শিত হত, তারা ওই সমস্ত ছার থেকে বঞ্চিত ছিল এবং সর্ব্বোপরি নিজেদেরটাও নিজেদেরকে তত্ত্বাবধান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হত। ভারতের ঔপনিবেশিক সরকারের রেলপথের প্রথাও ভারতীয় সংস্থাগুলির বি(দ্ধে ছিল। ভারতীয় ঠিকাদারদের কাছে বিদেশী দ্রব্য সরবরাহ করার থেকে ভারতীয় মালপত্র সরবরাহ করা সব থেকে কঠিন এবং খরচাসাপে(ছিল।

সবথেকে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় সংস্থাগুলির মধ্যে সুতোয় বোনা শিল্প-কারখানাগুলির প্রথম বি(্বযুদ্ধের আগে অনেকদূর অগ্রগতি ঘটেছিল। ১৮৫৩ সালে বম্বেতে কাওয়াসজি নানাভয় এই চর্কীকাটা সুতোর কল আরম্ভ করেন। ১৮৬০ সালের মধ্যে প্রায় ১০টি কটন মিল উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হয়। নাগপুর, আমেদাবাদ, সুরাট, সোলাপুরের বেশিরভাগ মিলের মালিকানা ভোগ করত ভারতীয় পুঁজিপতিরা।

১৮৮৭ সালে, জামশেদজি টাটা নাগপুরে Empress Mill প্রতিষ্ঠা করেন। রেলপথের সূত্রপাতের ফলে সুতোর কলকারখানাগুলির বাজার আরও বিকশিত হয় এবং ১৮৭৯ সালে ভারতবর্ষে ৫৬টা কলকারখানা স্থাপিত হয়, যা ১৯০৫ সালের মধ্যে ২০৬ টায় গিয়ে দাঁড়ায়। ১৯১৩ সালে, পৃথিবী যে সমস্ত টেক্সটাইল রপ্তানি দেশগুলো ছিল, তাদের মধ্যে ভারতের অবস্থান ব্রিটেনের ঠিক পরেই ছিল।

সূতি শিল্প ছাড়া, কিছু ভারতীয় পুঁজিপতিরা চা, অভ্র, জাহাজ নির্মাণের জিনিসপত্র এবং রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানাগুলিতে অর্থ বিনিয়োগ করত। উদাহরণস্বরূপ দ্বারকনাথ ঠাকুরের কথা বলা যেতে পারে ঊনিশ শতকের প্রথম ভাগে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন, নীল, চিনি, কয়লা এবং জাহাজ ব্যবসায়। এই সময়ে চায়ের চাষের প্রায় ৫% মালিকানা ভোগ করত ভারতীয় পুঁজি। ১৮৭৯ সালের সরকারী রিপোর্ট থেকে এটা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, হাজারিভাগ জেলায় ৩১১ অভ্রখনির প্রায় ৬৯ টার মালিক ছিলেন ভারতীয় ব্যবসায়ী পরিবারগুলি। রাসায়নিক এবং ওষুধ ব্যবসার (ে ত্রেও দেশীয় বিনিয়োগের উপস্থিতি ল(ণীয় ছিল। এ সম্বন্ধে একটা উল্লেখজনক বিষয় হচ্ছে যে ১৮৯২ সালে বাঙালী গবেষক পি. সি. রায় কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন 'Bengal Chemical and Pharmaceutical works', যা সে সময় একটা মুখ্য ওষুধ এবং রাসায়নিক প্রস্তুতকারক সংস্থারূপে পরিগণিত হয়। ঊনিশ শতকে দ্বারকনাথ ঠাকুর এর Carr Tagore and Company কয়লা খনিগুলিতে অর্থ বিনিয়োগ করেন এবং শতকের শেষভাগে আমরা দেখতে পাই যে ছোট ছোট ৬০টা কয়লাখনির মালিক এবং নিয়ন্ত্রক ছিলেন ভারতীয় ঠিকাদারেরা।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার কোনোভাবেই লোহা অথবা ভারি কারিগরী কারখানাগুলো উৎপাদনী ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করত না এবং ভারতীয়দের নিজেদেরকেই এ সমাধানের উপায় খুঁজে বের করত হত। ছুরি-কাঁচি তৈরীর সবচেয়ে

প্রাচীন কেন্দ্র ছিল বর্ধমান জেলার কাঞ্চননগরে। যদিও এই কেন্দ্রগুলি এবং হস্তশিল্পের কেন্দ্রগুলি গ্রামে স্থাপিত হয়েছিল, শহরের কেন্দ্রগুলো, যার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল কলকাতা শহরে অবস্থিত। বাংলাই এই রকম কেন্দ্রগুলির প্রথম পথপ্রদর্শক এবং ১৮৬৭ সালে হাওড়ায় কে. এল. মুখার্জি এ্যান্ড কোং হচ্ছে কেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রথম। আর কারিগরী কারখানাগুলোর মধ্যে ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত মার্টিন এ্যান্ড কোং এবং লর্ৌর Iron and Steel Co. সবচেয়ে উল্লেখজনক প্রচেষ্টা। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন Department of Commerce and Industry নামে একটি নতুন সরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এটা দেশীয় সংস্থাগুলোকে আরও নতুন করে উদ্যোগী করে তুলতে সাহায্য করেছিল। ১৯০৭ সালে, জামশেদজি টাটা জামশেদপুরে প্রতিষ্ঠা করেন Tata Iron and Steel Company (TISCO), যা লৌহ এবং ইস্পাত কারখানাগুলির মধ্যে এক যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করে। টাটা স্টীল তার প্রতিষ্ঠাতা জে. এন. টাটার অধ্যাবসায়ের এবং দূরদৃষ্টিতার এক প্রাঞ্জল উদাহরণ। টাটা গোষ্ঠী ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইস্পাত আমদানীকারক এবং ব্যাবসাকে ভালো বুঝতে পারত বলে তাঁরা খুবই আত্মবি্বাসের সঙ্গে অতি অল্প দামে ইস্পাত উৎপাদন করতে স(ম হয়েছিলেন। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে প্রধান বস্তুগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং গবেষণার পরে কারখানায় স্থাপিত হয়। Tata Steel, যদিও এই সময়ের অন্যান্য বড় বড় কারখানাগুলোর সঙ্গে একই মর্যাদা পেত তবুও সরকারের চাহিদার ওপর নির্ভর করত। Tata অথবা পারসী সম্প্রদায় ছাড়াও রাজস্থানের প্রদেশের মারোয়ার প্রদেশের মারোয়ারী সম্প্রদায় ভারতের শিল্প বাণিজ্যের ইতিহাসে এক গু(ত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, প্রথম থেকেই এরা ইউরোপীয় পরিচালন সংস্থাগুলির সঙ্গে পাট ত্র(য় অথবা কয়লা বিত্র(য় ব্যবসার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। ইউরোপীয় দমননীতি সত্ত্বেও। প্রথম বি্বযুদ্ধ এবং খুব অল্প পরিসরে এর আগের শতক 1920 সালে মারোয়ারী গোষ্ঠীকে এই ব্যবসায়ে প্রবেশ করার প(অনুকূল এবং সহায়ক হয়েছিল। শতাব্দী ঘুরতে না ঘুরতেই, প্রচুর পরিমাণে কাঁচা পাটের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা এবং রপ্তানি চলে এসেছিল মারোয়ারীদের হাতে। পাট ব্যবসায় মারোয়ারীদের উপস্থিতির সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ বিষয় ছিল কাঁচা পাটে ফাটকা এবং গুণচটের অভূতপূর্ব বিকাশ। পাট শিল্পের প্রধান পথপ্রদর্শক ছিলেন ঘনশ্যাম দাস বিড়লা এবং স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ যাঁরা ১৯২২ সালে মিল প্রতিষ্ঠা করেন। বাস্তবিক, ১৯১৯ এবং ১৯২২ সালের মধ্যে বিড়লাদের গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা এতটুকু বাড়িয়ে বলা নয়। তিনি দুটো সুতি শিল্প এবং একটি পাট শিল্পের কারখানা প্রস্তুত করেছিলেন সবচেয়ে অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে। ১৯২০ সালে বিড়লার উৎসাহ এবং শিল্প কারখানাগুলি লাভজনক অবস্থার ফলে আরো ছটা ভারতীয় মিল এবং একটি আর্মেনিয়ান মিল প্রস্তুত করা হয় কলকাতায়। তাঁত শিল্প থেকে তারা ১০% কিছু বেশি লাভ করতে পারত কিন্তু তাদের টিকে থাকা এবং বৃদ্ধি পাওয়া তাদেরকে একটা নীতি (মতা প্রদান করেছিল নির্বাসিতদের থেকে। বিপানচন্দ্রের মতে বছরের পর বছর ধরে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সর্বজন স্বীকৃত এবং গৃহীত ঐতিহ্যগত এবং আধুনিকতার মোড়কে মোড়া স্বদেশী ভাবধারাই ভারতের বৃদ্ধি পেতে থাকা দারিদ্রকে রোধ করতে এবং দেশীয় শিল্প কারখানাগুলিকে উৎসাহিত করতে সাহায্য করেছিল। বস্তুতঃ, (১৯০৫-১১) সালের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের সময় শতাধিক নতুন স্বদেশী কারখানা খোলা হয়েছিল যা লোহা চামড়া, টেক্সটাইল, রাসায়নিক, তামাক, চি(নি, কলম, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি উৎপাদনের কাজে যোগ দিয়েছিল।

প্রথম বি্বযুদ্ধ যুদ্ধমান দেশগুলোর উপাদনগুলোকে যুদ্ধ সামগ্রী সরবরাহ করার দিকে চালিত করেছিল। ভারতবর্ষ সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি কিন্তু ব্রিটেন করেছিল। এটা দুই পরস্পর-বিরোধী দিক ছিল। একদিকে, বি্বব্যাপী যুদ্ধ সামগ্রী কম পড়ার দ(ণ ভারতে তৈরী মালপত্রের চাহিদা বেড়ে গেছিল। কিন্তু অন্যদিকে, অস্ত্রশাস্ত্র, কাঁচা দ্রব্য, যন্ত্রাংশ অথবা রাসায়নিক দ্রব্য যা আমদানি করত ব্রিটেন বা তার শত্রুদেশ জার্মানী থেকে, তা বন্ধ হয়ে গেলো, তার ফলে, যদিও ভারতীয় জিনিসপত্রের চাহিদা অনেক বেড়ে গেল, কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ, করার মত জিনিসপত্র অঢেল ছিল না। কিছু শিল্প কারখানা, যেমন, ভারতীয় সুতী শিল্প কারখানা, জাহাজ এবং লৌহ ও ইস্পাত, এইরকম

পরিস্থিতির ফলে লাভবান হল কিন্তু অন্যান্যরা একেবারে লোকসানের মুখে পড়ল। সরকারী প্রথাকে কিছু পরিবর্তন করতে বাধ্য করল একদিকে যুদ্ধ এবং অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী অসন্তোষ। যুদ্ধ পর্যন্ত, শিল্পকারখানাগুলির উত্থানে কোন রকম হস্তে(প না করার সিদ্ধান্ত নিল সরকার।

যুদ্ধ, রেলপথ অথবা সরকারী কাজের জন্য যে শিল্পকারখানার জিনিসপত্র কেনার জন্য নির্ভর করতে হত ব্রিটিনের ওপর। এই নির্ভরশীলতার ফলে যুদ্ধের সময় ভারতে এই সামগ্রীগুলোতে হঠাৎ টান পড়ে। এটা সরকারের বি(দ্ধে সমালোচনাকে প্রমাণ করে যে সরকারপ(র আচরণ ভারতীয় ঠিকাদারদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না।

যুদ্ধের পর, সরকারের স্থানীয় উপাদানের দিকে নজর পড়েছিল এবং সেই উৎসগুলোকে উত্থিত করার কথাও চিন্তাভাবনা করছিল। ১৯১৮ সালে গঠিত Indian Munitions Board, ১৯১৬-১৮ সালের Indian Industrial Commission এবং ১৯২১-২২ সালে Indian Fiscal Commission—এই তিনটি ঘটনাই তাদের পরিবর্তিত চিন্তাভাবনার এক প্রতিভূ। যেসব সংর(ত শিল্প কারখানাগুলোর স্বাভাবিক সুযোগসুবিধা ছিল তাদেরকেই Fiscal Commission সংর(ত শুল্ক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল যা বিদেশী পণ্য-সামগ্রীর সঙ্গে বিনা সুর(ায় প্রতিযোগিতা করতে পারবে। কিন্তু সরকার, ভারতীয় শিল্পকারখানাগুলোর মালিকদের বি(দ্ধে পার্থক্য গড়ে তুলেছিল। বস্তুত, ১৯২৩ এবং ১৯৩৯ সালের মধ্যে সংর(ত শুল্কের চাহিদার জন্য ৫১টা ঘটনা নথিভুক্ত(হয়। এর মধ্যে ১১টার জন্য শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেগুলো মধ্যে পড়েছিল নুন, ভারি রাসায়নিক দ্রব্য, প্রাইউড, লোহা ও ইস্পাত, সূতীবস্ত্র, চিনি ইত্যাদি। ঔপনিবেশিক প্রতিবন্ধকতা এবং অসহযোগিতা সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্থাগুলো অগ্রগতি ঠিক ভাবেই হচ্ছিল। Industrial Commission প্রায়োগিক শিল্প এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, ফলে ১৯৩৯ সালে দেশে ২,৫০০ ছাত্রকে নিয়ে তৈরী হল শুধু ৭টা Engineering College ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে প্রায়োগিক বিদ্যা অপর্যাপ্ততাই ব্যাখ্যা করে যে অটোমোবাইল, যন্ত্রাংশ এবং বিমানচালনাসংত্র(ান্ত শিল্পকারখানাগুলোর (ে ত্রে ভারতীয় সংস্থাগুলির অনুপস্থিতি।

শিল্পকারখানাগুলোর জন্য রাজ্যের কাছ থেকে যে সাহায্য চাওয়া হত তা পরিস্কার ভাবে দেখতে গেলে বোঝা যায় যে, এই চাহিদা ভারতীয় নেতৃত্বের মধ্যে অর্থনীতিবিদদের দ্বারাই উচ্চারিত হত এবং সাধারণতঃ জাতীয়তাবাদী প্রেস-এ অথবা কংগ্রেস আলোচনা সভায় প্রসঙ্গটা উত্থিত হত না। এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করার উৎসাহের ছিল যা একধরনের সংশয় সৃষ্টি করেছিল সে বিদেশী সরকার যতই বন্ধুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তারা কখনই স্বদেশীয় উৎপাদকদের বি(দ্ধে গিয়ে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করলেও ১৮৯০ সালের জানুয়ারী মাসের পুণা সর্ব্বজনিক সভার পত্রিকায় ১৮৯০ ৩রা ফেব্রুয়ারী Hindu পত্রিকায় 'The Economic Situation in India' নামক প্রবন্ধে G. V. Joshi খুব বিচ(ণতার সঙ্গে পর্যবে(ণ করেছেন যে, ইংল্যান্ড চাইত দেশীয় শিল্পকারখানাগুলিকে যতটা সম্ভব নিচুস্তরে নামিয়ে আনা, যাতে তারা সরকারী বিকাশের পথে কোনোরকম উৎসাহ না পায়। সবচেয়ে বড় সুবিধা যা ইংরেজ শাসক দেখেছিল এবং ভারতের নির্ভরশীলতা থেকে উপলব্ধি করেছিল যে শিল্পসামগ্রীর সরবরাহ করার জন্য ভারত হচ্ছে এক বিশাল বাজার। এইরকম অবস্থায় সরকার কাছ থেকে কোনো কিছু আশা করাও বৃথা যা পুনার লেখক বলেছেন।

৮.২ গ্রন্থপঞ্জি

১. বিপান চন্দ্র—ইকোনমিক ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া

২. তীর্থঙ্কর রায়—দ্যা ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া (১৮৫৭-১৯৪৭)

৩. A. K. Bagchi—Private Investments in India

৪. এস. কে. সেন—দ্যা হাউস অফ টাটা

৫. আম্বা প্রাসাদ—ইন্ডিয়ান রেল ওয়েজ

৮.৩ অনুশীলনী

১. ভারতের আধুনিক শিল্প কিভাবে গড়ে ওঠে? এবং এই আধুনিক শিল্পের সীমাবদ্ধতা কি ছিল?

২. রেলপথ নির্মাণের উদ্দেশ্য কি ছিল?

৩. রেলপথ নির্মাণের বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪. রেলপথ নির্মাণের ফলশ্রুতি আলোচনা কর।